পরকালের সম্বল

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ
ইয়াহইয়া মানিরী (রাহঃ)

মাওলানা মুহম্মদ সুহাইল (রাহঃ) ফাউন্ডেশন
ঢাকা

এবং যে ব্যক্তি আখেরাতের কল্যাণকে তার লক্ষ্যে পরিণত করবে,
আমি তাকে অবশ্যই তা দান করব। —আল কুরআন

পরকালের সম্বল

সুলতানুল মোহাক্কেকীন হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া
মানিরী (রহ.) রচিত ফাওয়ায়েদুল মুরিদীন পুস্তিকার অনুবাদ

অনুবাদ
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক : মাসিক মদীনা, ঢাকা।

প্রকাশক
মাওঃ মুহাঃ সোহাইল ফাউন্ডেশন
১৪২, পূর্ব তেজতুরিবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা

www.pathagar.com

পরকালের সম্বল

মূল

সুলতানুল মোহাক্কেকীন হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানিরী (রহ.)

প্রকাশক

মাওলানা মুহাম্মদ সুহাইল ফাউন্ডেশনের পক্ষে

আলহাজ্জ মুহাম্মদ বশীরুদ্দীন

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ঃ রবিউল আওয়াল ১৪২৮ হিজরী

২য় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর-২০০৯ ইংরেজী

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মদীনা প্রিন্টার্স

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রচ্ছদ

মদীনা গ্রাফিক্স

৫৫/বি (২য় তলা) পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

মূল্য ঃ ৫০.০০ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সুলতানুল মেহাক্কেকীন হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানিরীর (রহ) সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৫
কালেমা তৈয়্যবা শরীফের ফযীলত	১০
দরূদ শরীফের ফযীলত	১২
তওবা-এস্তেগফারের ফযীলত	১৪
জামাতের সাথে নামায এবং জামাত ত্যাগ করা সম্পর্কে সতর্কবাণী	১৫
আয়াতুল-কুরসী, সূরা ফাতেহা এবং আরও কিছু সংখ্যক বিশেষ সূরা ও আয়াতের ফযীলত	১৮
মৃত্যুর বিভীষিকা	২৩
কবরের জীবন	২৭
জান্নাত ও তার নেয়ামতসমূহ	৩২
এ ব্যাপারে ভীত থাকা যে, দুনিয়া থেকে মুসলমান হয়ে যাবো নাকি কাফির অবস্থায়?	৩৬
জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া ও জাহান্নামে প্রবেশ	৪০
কিয়ামতের পর্যালোচনা ও তার কঠোরতা	৪৩
জাহান্নাম ও তার শাস্তি	৪৬
গীবত	৪৯
মাতা-পিতার হক	৫২
মসিবত ও তাতে ধৈর্য ধারণ	৫৫
মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বিলাপ করা	৫৭
মাতা-পিতার উপর সন্তানের হক	৫৮
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	৬১
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	৬৩
আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক	৬৬
প্রতিবেশীর হক	৬৮
কর্মচারী ও খেদমতগারদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য	৭০

www.pathagar.com

মাওলানা মুহাম্মদ সুহাইল (রহ.) ফাউণ্ডেশন

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সুহাইল (রহ.) ছিলেন এদেশের একজন বিশিষ্ট আলেম এবং প্রখ্যাত একটি শিল্পপতি পরিবারের সন্তান। দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দীনি এলেমে সর্বোচ্চ সনদ লাভ করার পর পারিবারিক ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হয়ে পড়েন এবং একই সাথে এলমে দীন চর্চা ও দাওয়াতে-তবলীগের কাজে নিজেকে জড়িত রাখেন। এদেশের দীনি মাদরাসাগুলোর সাথে ছিল তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। এসব প্রতিষ্ঠানে উদার হস্তে সাহায্য-সহযোগিতার পাশাপাশি তিনি একাধিক মাদরাসাও গড়ে তুলেছিলেন। উত্তরাঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বগুড়ার জামিল মাদরাসাটি তিনি তাঁর ছোট ভাই আলহাজ্জ মুহাম্মদ জামিল উদ্দীনের নামে এককভাবে গড়ে তুলেছিলেন। জামিলউদ্দীন শিল্পপরিবারের প্রধান অভিভাবক হিসেবে নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে এ পর্যন্ত এর পরিচালনার ব্যয়ভারও প্রধানত এই ধর্মপ্রাণ পরিবারটিই বহন করে যাচ্ছেন। বগুড়ার ন্যায় একটি শিল্পোন্নত শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কয়েক কোটি টাকা মূল্যের জমিজমা এই পরিবার জামিল মাদরাসার জন্য দান করেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশে এবং ইতোপূর্বে তদানীন্তন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এমন কোনো উল্লেখযোগ্য মাদরাসা ছিল না, যাতে জামিল পরিবারের পক্ষ থেকে অনুদান পৌঁছত না। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সুহাইল (রহ.) এসব দান-অনুদানের বিষয়টি নিতান্ত যত্নের সাথে তদারক করতেন। যদিও পরিবারের প্রধান মুরুব্বী মাওলানা মুহাম্মদ সুহাইল এখন আর দুনিয়াতে নেই, তাঁর অন্য আরও দুই ভাই জনাব মুহা. নাসির উদ্দীন ও জনাব মুহা. আজিজুদ্দীনও ইন্তেকাল করেছেন, তবে হযরত মাওলানা সাহেবের ছোট ভাই আলহাজ্জ মুহাম্মদ বশীরউদ্দীন এবং আলহাজ্জ মুহাম্মদ জামিলুদ্দীন এখনও জীবিত আছেন এবং বিভিন্নমুখী জনসেবা ও দীনি কাজকর্মে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন।

www.pathagar.com

দীনি খেদমত এবং ব্যাপক জনকল্যাণ ব্রতী এই পরিবারটির পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে পারিবারিক ঐতিহ্য ধরে রাখার প্রবল আগ্রহেরই ফসল 'মাওলানা মুহা. সুহাইল ফাউন্ডেশন'। আল্লাহপাক তওফীক দিলে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দীন ও এলমে-দীনের সর্বমুখী খেদমত অব্যাহত থাকবে বলে উদ্যোগীগণ আশা পোষণ করেন।

উপমহাদেশের আধ্যাত্মিক জগতের একজন শীর্ষ ব্যক্তিত্ব হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানিরীর (রহ.) একটি পুস্তিকার অনুবাদ ও তা প্রকার করার মাধ্যমে মাওলানা মুহাম্মদ সুহাইল ফাউন্ডেশনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো। সার্বিক কামিয়াবীর জন্য সকলের দোয়া প্রার্থী।

জীবনে চলার পথে আখেরাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করাই হচ্ছে মুমিন জীবনের প্রধান সাফল্য। হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানিরীর (রহ.) এই পুস্তিকাটি আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমাদের ধারণা। বিশ্ববিখ্যাত একজন ওলীর এই বক্তব্যগুলো আধ্যাত্মিকতার এক অমূল্য সম্পদ। আশা করি পাঠকগণ এগুলো দ্বারা উপকৃত হবেন।

ইতোপূর্বে বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে অতি অল্পদিনের মধ্যেই আগ্রহী পাঠকগণের হাতে হাতে চলে গেছে। সেজন্য দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি মাওলানা মুহাম্মদ সুহাইল ফাউণ্ডেশনের কার্যক্রম ক্রমাগত অব্যাহত থাকবে। আমরা সকলের দোয়া প্রার্থী!!

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সুলতানুল মোহাক্কেকীন হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানিরীর (রহ.) সংক্ষিপ্ত পরিচয়

যে কয়জন শীর্ষস্থানীয় আওলিয়ায়ে কেরামের পদভারে আমাদের এই উপমহাদেশের মাটি ধন্য হয়েছে, তাঁদের মধ্যে হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানিরী (রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত একজন। লাহোরে সমাহিত হযরত দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবিরী (রহ.), আজমীরের হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী (রহ.), সিলেটের হযরত শাহজালাল মুজাররাদ ইয়ামানির (রহ.) ন্যায় অনেক শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ বহির্জগৎ থেকে তশরিফ এনে এদেশের মানুষকে ধন্য করেছেন। তাঁদের সংস্পর্শে এসে এদেশের বহু সন্তান এলেম চর্চা এবং অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সেসব মহামানবের পুণ্য পরশে ধন্য হয়ে এদেশেও জন্ম নিয়েছেন অসংখ্য বিশ্বমানের আলেম ও অধ্যাত্ম সাধক।

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া (রহ.) সে ধরনেরই একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম ও সাধকপুরুষ। তাঁর জন্ম বিহারের মানির নামক এক জনপদে ৬৬১ হিজরীর ২৬ শে শাবান তারিখে বিশ্ববিখ্যাত এক সাধক পরিবারে। তাঁর পিতামহ হযরত তাজ ফকীহ (রহ.) ছিলেন ফিলিস্তীনের অধিবাসী। দীন প্রচারের উদ্দেশ্যেই তিনি এদেশে আগমন করেছিলেন। শায়খ তাজ ফকীহর জ্যেষ্ঠ সন্তান মখদুম ইয়াহইয়ার শাদী হয়েছিল হযরত শায়খ শেহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দ্দির (রহ.) কন্যা বিবি রাজিয়ার সাথে। এই বিদূষী ওলী কন্যার গর্ভেই মখদূম আহমদ শরফুল হক ওয়াদদীন (রহ.) এর জন্ম।

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানিরীর (রহ.) শিক্ষা জীবন শুরু হয় পারিবারিক পরিবেশে তদানীন্তন কালের প্রচলিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পবিত্র কুরআন হেফজ করার মাধ্যমে। তিনি যখন কৈশোরে উপনীত হলেন, তখন সে যুগের একজন বিশ্ববিখ্যাত হাদীস তত্ত্ববিদ আলেম শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারী (রহ.) দিল্লী থেকে বাংলাদেশের সোনারগাঁও যাওয়ার পথে মানিরে এসে উপনীত হন। হযরত আবু তাওয়ামা বুখারী (রহ.) সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের শাসনামলে

www.pathagar.com

(১২২৮-১২৮১ খ্রি.) বুখারা থেকে দিল্লীতে আগমন করেছিলেন। দিল্লী তখন সমগ্র আলমে ইসলামের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে বিবেচিত হতো। হযরত আবু তাওয়ামা (রহ.) দিল্লীতে অবস্থান কালে উচ্চতর জ্ঞান চর্চার একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিছুদিন এলমে-দীনের খেদমত করার পর গায়েবী ইশারায় তদানীন্তন মুসলিম-বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। পথিমধ্যে বিহারের মানিরে বিশিষ্ট আলেম ও সাধক হযরত শরফুদ্দীন ইয়াহইয়ার খানকায় কয়েকদিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেন। হযরত আবু তাওয়ামা বুখারী (রহ.) মানির থেকে সোনারগাঁও রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত ইয়াহইয়া মানিরীর কিশোরপুত্র আহমদ বিন্ ইয়াহইয়া মানিরীকে সঙ্গে দিয়ে দেন।

সোনারগাঁওয়ে হযরত আহমদ ইয়াহইয়া মানিরী (রহ.) বাইশ বছর অবস্থান করেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি তফসীর, হাদীস এবং তখনকার যুগের উচ্চতর দীনি এলেমের সকল শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করার পর তিনি উস্তাদের কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একমাত্র পুত্র সন্তান মখদূম যাকিউদ্দীন জন্মগ্রহণ করার পর স্ত্রীর ইন্তেকাল হয়ে যায়। ইতোমধ্যে পিতা হযরত ইয়াহইয়ার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে। শেষ পর্যন্ত শোকসন্তপ্ত মায়ের নির্দেশে তিনি দেশে ফিরে যান।

কিছুদিন মানিরে অবস্থান করার পর হযরত শরফুদ্দীন আহমদ নিজেকে অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে বিলীন করে দেওয়ার লক্ষ্যে অস্থির হয়ে পড়েন। মায়ের অনুমতি নিয়ে শিশুপুত্র মখদূম যাকিউদ্দীনকে মায়ের জিম্মায় রেখে দিল্লীর পথে বের হয়ে গেলেন। দিল্লী এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে তখন অনেক সাধক পুরুষের অবস্থান ছিল। হযরত আহমদ মানিরী (রহ.) একে একে অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। হযরত নিজাম উদ্দীন সোলতানুল আওয়লিয়ার (রহ.) সাথে সাক্ষাতের পর তাঁরই পরামর্শে হযরত খাজা নজীবুদ্দিন ফেরদৌসীর (রহ.) দরবারে হাজির হন। প্রথম সাক্ষাতেই হযরত নজীবুদ্দীন ফেরদৌসী (রহ.) হযরত আহমদ ইয়াহইয়া মানিরীকে অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁকে স্নেহভরে সম্বোধন করে বলেন, দরবেশ এস! তোমার হাতে একটি পবিত্র আমানতের বোঝা অর্পণ করার উদ্দেশ্যেই আমি অপেক্ষমান আছি।

www.pathagar.com

হযরত শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানিরী (রহ.) পীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করার সাথে সাথেই এক অদ্ভুত অনুভূতিতে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত এবং অন্তর মধ্যে কম্পনের সৃষ্টি হয়ে গেল।

বায়আত করার সঙ্গে সঙ্গেই হযরত নজীবুদ্দীন ফেরদৌসী (রহ.) আকাঙ্ক্ষিত সাগরেদকে খেলাফত দিয়ে বিদায় করে দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। বললেন, আল্লাহর শুকুর যে, পবিত্র আমানত প্রকৃত হকদারের হাতে সোপর্দ করা সম্ভব হলো।

হযরত শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানিরী (রহ.) আরজ করলেন, কিছু সময় অবস্থান করে প্রয়োজনীয় অনুশীলন গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করতে চাই। জবাবে মহান সাধক বললেন, তোমাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানোর দায়িত্ব খোদ নবী করীম (সা.)-এর উপর অর্পিত। অন্য কোথাও অনুশীলন করার প্রয়োজন নেই। অতঃপর কিছু উপদেশ দিয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন। বিশেষভাবে বলে দিলেন যে, তুমি সম্মুখপানে অগ্রসর হতে থাকবে। দিল্লীর সীমানা অতিক্রম করার পর যদি কোনো দুঃসংবাদও শ্রবণ করো, তবুও যাত্রা বিরতি করো না বা পিছনের দিকে ফিরে এসো না। তুমি এখন থেকে একান্তভাবেই আল্লাহর নিকট সোপর্দকৃত। তাঁর ইচ্ছাতেই তোমার চলার পথ নির্ধারিত হবে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, দিল্লীর সীমানা অতিক্রম করার সাথে সাথেই তিনি শুনতে পেলেন যে, তাঁর মহান মুর্শিদের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু নিষেধ করা ছিল, তাই হযরত শরফুদ্দীন আর পিছন ফিরলেন না। ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকলেন। কাফেলা যখন বিহার প্রদেশের সীমার মধ্যে পৌঁছলো তখন হঠাৎ করেই একদিন তাঁর মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিল। তিনি জঙ্গলের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। তাঁর এই নিরুদ্দেশ জীবন সর্বমোট প্রায় বারো বছর বলে বর্ণনা করা হয়। এর মধ্যে এই সাধক পুরুষ যে কঠোর তপস্যার জীবন অতিক্রম করেছেন, তা বর্ণনার অতীত।

দীর্ঘকাল পর লোকেরা রাজগীরের জঙ্গলে তাঁর সন্ধান লাভ করে এবং বিহার শরীফে নিয়ে আসে। অবশিষ্ট জীবন তাঁর এখানেই অতিবাহিত হয়। এই মহান দরবেশের সন্ধান লাভ করে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল এমনকি মধ্য এশিয়া ও আরব-জাহানেরও বহু সাধক আলেম-দরবেশ বিহার শরীফে সমবেত হন। সর্বক্ষণ তিনি দীনি এলেম ও অধ্যাত্মবিদ্যার

www.pathagar.com

তালীম নিয়ে নিমগ্ন থাকতেন। ৭৮২ হিজরীর ৬ শাওয়াল বুধবার বিহার শরীফেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। তাঁর বংশধারা এবং সাগরেদগণের দ্বারা এলমেদীন ও ছূফী সাধনার ধারাবাহিকতা এখনও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেমগণের মধ্যে হযরত শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানিরীর (রহ.) অনুসৃত ও প্রচারিত ফেরদাউসিয়া তরিকার অনেক সাধক রয়েছেন।

হযরত শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানিরীর (রহ.) এলেম ও আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকার ছোট বড় প্রায় পঁচিশটি মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর রচনার প্রতিটি ছত্রই এলেম ও মারেফাতের এক একটি রত্নভাণ্ডার বিশেষ। বিশেষত তিন খণ্ডে সমাপ্ত পত্রাবলী যথাক্রমে, মকতুবাতে সদী, মাকতুবাতে দু'সদী, মাকতুবাতে বিস ও হাশত, মলফুজাত সংকলন মাদানুল মা'আনী তাসাউফ শাস্ত্রের অসাধারণ সম্পদ। তাঁর সবগুলি রচনাই ফারসী ভাষায় রচিত। তবে উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়ে গেছে। যইন বদর (রহ.) নামক আরব দেশীয় একজন বিশিষ্ট আলেম কর্তৃক সংকলিত আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছে তবে আরবী ভাষায় তাঁর কিছু মালফুজাত এখনও অনূদিত হয় নাই বলে জানা যায়।

বাংলা ভাষায় হযরত শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানিরীর (রহ.) মাকতুবাত শরীফের অল্পকিছু অংশ অনূদিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে এখন আর সেটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর রচিত ক্ষুদ্র একটি পুস্তিকা 'ফাওয়ায়েদুল-মুরিদীন'-এর উর্দু সংস্করণ থেকে অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকগণের খেদমতে পেশ করার জন্য আমার বিশিষ্ট মুরুব্বী জনাব হাজী মুহাম্মদ বশীরুদ্দীন নির্দেশ দেওয়ায় এটি বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশক করা হচ্ছে। এই ছোট পুস্তিকাটি মালফুজাত ধর্মী। পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এটি বিশেষ উপকারী মনে হওয়ায় বাংলা অনুবাদ করতে উদ্যোগী হয়েছি। আশা করি, এই পুস্তিকার বিষয়বস্তুগুলি পাঠ করে সকলেই পরকালের সম্বল সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হবেন। মুনাজাত করি, আল্লাহপাক আমাদের এই সামান্য উদ্যোগ কবুল করুন।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক, মাসিক মদীনা, ঢাকা।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

কালেমা তৈয়্যবা শরীফের ফযীলত

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু দারদা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন– 'যখন কোনো বান্দা ঈমান আনার লক্ষ্যে কালেমা শরীফ অর্থাৎ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' উচ্চারণ করেন, তখন তাঁর মুখ থেকে গাঢ় সবুজ বর্ণের দু'টি পাখির বেশে দু'জন ফেরেশতা বের হয়ে আসেন। এদের দু'টি পাখা এতো বড় যে তা মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যেতে সক্ষম। এই ফেরেশতা দু'জন ঊর্ধ্বজগতে আরশের নীচে পৌঁছে যায়। তাঁদের মুখ থেকে মধু-মক্ষিকার আওয়াজের ন্যায় গুন-গুন আওয়াজ বের হতে থাকে। আরশে-আজিমে বিদ্যমান ফেরেশতাগণ এই দুই আগন্তুক ফেরেশতাকে বলতে থাকেন, চুপ হও! আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের মহা-পরাক্রমের প্রতি লক্ষ্য করে আওয়াজ বন্ধ করো! তখন আগন্তুক দুই ফেরেশতা বলেন, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যে পর্যন্ত কালেমা শরীফ পাঠকারী বান্দার সমস্ত গোনাহ মাফ করে না দেন, সে পর্যন্ত আমরা চুপ হতে পারি না। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে, 'নিঃসন্দেহে আমি কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পাঠকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'

অতঃপর আল্লাহ জাল্লা শানুহু উক্ত দুই ফেরেশতাকে সত্তুর হাজার যবান দান করেন, যে দু'টি যবান দ্বারা এরা কেয়ামত পর্যন্ত কালেমা শরীফ পাঠকারী বান্দার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে। কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর এই দুই ফেরেশতা কালেমা শরীফ পাঠকারী বান্দার নিকট হাজির হয়ে হাত ধরে তাকে 'পুলসিরাত' পার করে দিবেন।

হযরত আবদুল্লাহ তারালেকি (রহ.) বর্ণনা করেন– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্যটির মধ্যে চব্বিশটি হরফ রয়েছে এবং রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টায় বিভক্ত। যখন কোনো বান্দা নিষ্ঠাপূর্ণ অন্তরে কালেমা শরীফ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' উচ্চারণ করে

www.pathagar.com

তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে, 'হে আমার বান্দা! তুমি যে কালেমা শরীফ পাঠ করলে এর মধ্যে চব্বিশটি হরফ রয়েছে। রাত এবং দিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তুমি প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, জেনে না জেনে মুখের কথায় বা কাজে ছোট-বড় যেসব গোনাহ করেছ কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ইজ্জতের প্রতি লক্ষ্য করে তোমার সে সবগুলো গোনাহই আমি ক্ষমা করে দিলাম।'

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পাঠ করবে, সে বেহেশতবাসী হবে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল, বেহেশেতের মূল্য কী? জবাবে বলেছিলেন, কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্য থেকে কোনো একজনের নিকট এই মর্মে অহী প্রেরণ করা হয়েছিল যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্যটি আমার দুর্গবিশেষ! যে ব্যক্তি এই দুর্গে প্রবেশ করবে সে দোযখের আগুন থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।

বর্ণিত আছে যে, রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা কিছু লোককে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তোমরা 'ঢাল' এর ব্যবস্থা করো। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শত্রু প্রতিহত করার ঢাল? বললেন, না। জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করার ঢাল। লোকেরা আরজ করলেন, জাহান্নামের আগুন প্রতিহত করার ঢাল কিরূপ হতে পারে? বললেন, "সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল আজিম!'

আবি মাকনা ইমাম ইয়ালার (রা.) বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, একদা তিনি আরজ করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! লোকেরা সদকা করে পুণ্য অর্জন করে থাকে কিন্তু আমার নিকট সদকা দেওয়ার মতো কোনো

www.pathagar.com

কিছু নাই। তবে আমি 'সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম' পড়ে থাকি। একথা শুনে হযরত নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছিলেন 'এই বাক্যগুলো নিয়মিত পাঠ করা মিসকিনদের মধ্যে এক মণ স্বর্ণ সদকা করার চাইতে বেশী পুণ্যের কাজ।

হযরত নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন, দু'টি বাক্য সুবহানাল্লাহি ওয়াবেহামদিহী ওয়া সুবহানাল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম ওয়া বেহামদিহী' মুখে উচ্চারণ করা নিতান্ত সহজ তবে নেকীর পাল্লায় অত্যন্ত বেশি ওজন বিশিষ্ট এবং আল্লাহর নিকট প্রিয়।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশ' বার 'সুবহানাল্লাহ ওয়া বেহামদিহী' পাঠ করে তার জীবনের সমস্ত গোনাহ আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন। এই গোনাহ সমুদ্রের পানির বরাবর হলেও!

দরূদ শরীফের ফযীলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, 'বিশ্ব চরাচরে যতো মুসলমান আছে, তাদের মধ্য থেকে যে কেউ আমার প্রিয় নবীর প্রতি যদি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে তবে আমি মালিক স্বয়ং এবং আমার ফেরেশতাগণ সে ব্যক্তির প্রতি দশবার দরূদ প্রেরণ করে থাকি।'

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দরূদ প্রেরণের অর্থ রহমত দান করা এবং ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে দরূদ প্রেরণের অর্থ আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট সে ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

হযরত নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন, প্রতিটি দোয়া উর্ধ্বজগতে একটি পর্দার সম্মুখীন হয়। হুজুর (সা.) এবং তাঁর আল-আওলাদের প্রতি দরূদ পাঠের সমন্বয়ে দোয়া করলে সেই পর্দা সরে গিয়ে দোয়া কবুল হওয়ার স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যে দোয়ার পর দরূদ শরীফ পড়া হয় না সেই দোয়া দুনিয়ার দিকে ফিরে আসে।

www.pathagar.com

হযরত নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন, আমার ওফাতের পরও তোমাদের মধ্য থেকে যেখানে যে ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম পাঠ করবে, তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছে দেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক আপনার বরাবরে সালাম প্রেরণ করেছে; তখন আমি বলবো, ওয়া আলাইকাস্‌সালাম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

রাসূল (সা.) এরশাদ করেন, আল্লাহ্‌পাক দুজন ফেরেশতা নিয়োজিত করে রেখেছেন যেন কোনো মজলিসে বা কারো সামনে আমার নাম উচ্চারিত হলে শ্রবণকারীরা আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে তখন সেই দুজন ফেরেশতা এই মর্মে দোয়া করেন যে, আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। এই দোয়ার সঙ্গে অন্য ফেরেশতাগণ আমীন বলে থাকেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, কোনো কাগজের ওপর যদি আমার প্রতি দরূদ শরীফ লিখিত হয়, তবে যে পর্যন্ত লেখাটি অবশিষ্ট থাকে সে পর্যন্ত ফেরেশতাগণ লেখকের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকেন। মৃত্যুর পর লোকেরা ইমাম শাফেয়ীকে (রহ.) স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হে ইমামুল মুসলিমীন! আল্লাহ্‌পাক আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? বলেছিলেন, আল্লাহ্‌পাক আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ পুণ্যের জন্য আপনার এই সৌভাগ্য হয়েছে? বললেন, পাঁচটি বাক্যের একখানা দরূদ শরীফ আমি পাঠ করতাম। সেই দরূদের বরকতেই আল্লাহ্‌পাক কোনো হিসাব না নিয়েই আমার প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন।

দরূদের সেই বাক্যগুলো হচ্ছে, "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ বেআদাদে মান সাল্লা আলাইহি, ওয়া সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন বেআদাদে মান লাম ইউসাল্লি আলাইহি। ওয়া সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন বেমা তুহিব্বু ওয়া তারযা আন ইউসাল্লি আলাইহি ওয়া সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা আমারতানা বিস্‌সালাতে আলাইহি"।

আমিরুল-মুমিনীন হযরত ওসমান (রাঃ) বর্ণণা করেন, যে ব্যক্তি প্রতি জুমাবারে নবী করীম (সা.)-এর প্রতি একশ' বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, হাশরের দিন আল্লাহ্‌পাক সেই বান্দাকে এই পরিমাণ নূর দান করবেন, যা দুনিয়ার সকল মানুষকে প্রদত্ত নূরের অর্ধেক পরিমাণ হবে।

www.pathagar.com

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি জুমাবারে হযরত নবী করীম (সা.)-এর বরাবরে একশত বার দরূদের হাদিয়া প্রেরণ করবেন, আল্লাহ্পাক তার সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দিবেন। যদি সেই গোনাহ্ সমুদ্রের পানির বরাবরও হয়!

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন, জুমার দিন যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশতবার দরূদ প্রেরণ করবে, আল্লাহ্পাক তার একশতটি প্রয়োজন মিটাবেন। এর মধ্যে সত্তরটি দুনিয়ার প্রয়োজন এবং ত্রিশটি আখেরাতের।

আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা সাইয়্যেদেনা মাওলানা মুহাম্মদ।

তওবা-এস্তেগফারের ফযীলত

এস্তেগফারের অর্থ বিনয় অবনত চিত্তে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতে এরূপ কোনো পাপ কর্মে লিপ্ত না হওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা।

হাদীস শরীফে আছে যে, সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছে এস্তেগফার। এস্তেগফারের বদৌলতে কবীরা গোনাহ্ সগীরায় পরিণত হয়। আবার এস্তেগফার না করার পরিণতিতে ছগীরা গোনাহ কবীরায় পরিণত হতে পারে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আরজ করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমাকে এমন কোনো দোয়া শিখিয়ে দিন যা নামাযে পড়তে পারি। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা দেওয়া হলো, আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফসি জুলমান কাছিরাওঁ ওয়ালা ইয়াগফিরুজ্ জুনুবা ইল্লা আন্‌তা ফাগফিরলি, মাগফিরাতাম্ মিন ইনদিকা, ওয়ার হামনি, ইন্নাকা আন্‌তাল গাফুরুর-রাহীম।' উল্লেখ্য যে, এস্তেগফারের এই সর্বোত্তম কথাগুলো আত্ত্যাহিয়াতুর অংশে পরিণত হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, স্বয়ং নবী করীম (সা.) দৈনিক অন্তত একশতবার তওবা-এস্তেগফার পাঠ করতেন। যে ব্যক্তি আস্তাগফেরুল্লাহীল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুমুল মুস্তাগেছীনা ওয়াস্‌তাগফেরু ওয়া আতুবু ইলাইহে। লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুমুল মোস্তাগেছীনা

www.pathagar.com

ওয়াস্‌তাগফেরুহু ওয়া আতূবু ইলাইহে, ইন্নাহু হুয়াত্‌ তাওয়াবুর রাহীম' একবার পড়বে, তার গোনাহ্‌ মাফ হওয়ার উছিলা হয়ে যাবে। যে দুইবার পড়বে, তার নিজের এবং পিতা-মাতার গোনাহ মাফ হওয়ার উছিলা হয়ে যাবে। যদি কেউ তিনবার পাঠ করে তবে তদ্বারা সমস্ত উম্মতের গোনাহ মাফ হওয়ার উছিলা হতে পারে।

জামাতের সাথে নামায এবং জামাত ত্যাগ করা সম্পর্কে সতর্কবাণী

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ, যে ব্যক্তি একাধারে চল্লিশ দিন তকবীরে-উলার সাথে জামাতে নামায আদায় করতে পারে তার জন্য দুইটি নাজাত লিপিবদ্ধ হয়। প্রথমত দোজখের আগুন থেকে রেহাই দ্বিতীয় মুনাফেকীর অভিশাপ থেকে মুক্তি।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, জামাতের সাথে নামায আদায় করার ব্যাপারে যত্নবান থেকো। যে মুমিন ব্যক্তি ইমামের সাথে তকবীরে-উলায় শরীক থাকে, সে অসংখ্য হজ্ব এবং ওমরার চাইতেও বেশি পুণ্যের অধিকারী হয়।'

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে যে, জামাতের সাথে নামায আদায় করা সুন্নাতে-মোয়াক্কাদাহ। একমাত্র মুনাফেকরাই ইচ্ছাকৃতভাবে জামাতের সাথে নামায আদায় উপেক্ষা করে থাকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, পাঁচ ওয়াক্তের নামায পাঁচটি ঝর্নাধারার অনুরূপ যা তোমাদের দরওয়াজার সম্মুখ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। যে ব্যক্তি যত্নের সাথে এই ঝর্নাধারায় অবগাহন করবে তার শরীরে পাপের পংকিলতা অবশিষ্ট থাকতে পারে না।

হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেউ যদি এরূপ কামনা করে যে, আল্লাহ পাক যেন তাকে সর্বপ্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে মুক্ত রাখেন, তাহলে সে যেন পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথা নিয়মে আদায় করে।

www.pathagar.com

হযরত মাআয (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মেরাজের রাতে প্রথম আসমানে পৌঁছে দেখতে পান. ফেরেশতাগণের একটি বিরাট জামাত তকবীর দিতেছেন। তাঁকে বলা হলো যে, জন্মের মুহূর্ত থেকেই এরা তকবীরে নিয়োজিত আছেন। দ্বিতীয় আসমানে দেখতে পেলেন, সেখানকার বিরাট একদল ফেরেশতা কিয়ামের অবস্থায় রয়েছেন। তাঁকে বলা হলো যে, জন্মের পর থেকেই এরা এই অবস্থায় রয়েছেন। তৃতীয় আসমানে একদল ফেরেশতাকে কেরাআতের অবস্থায় দেখতে পেলেন। তাঁকে বলা হলো জন্মের পর থেকেই এরা এই অবস্থায় রয়েছেন। চতুর্থ আসমানে একদল ফেরেশতাকে রূকু অবস্থায় দেখতে পেলেন। তাঁকে বলা হলো যে, জন্মের পর থেকেই এরা এই অবস্থায় রয়েছেন। পঞ্চম আসমানে গিয়ে দেখতে পেলেন, একদল ফেরেশতা রুকুর পরবর্তী 'কওমা' অবস্থায় আছেন। তাঁকে বলা হলো, জন্মের পর থেকেই এরা এই অবস্থায় আছেন। ষষ্ঠ আকাশে গিয়ে দেখতে পেলেন, একদল ফেরেশতা সেজদায় পড়ে আছেন। জন্মাবধি তাঁরা এই অবস্থায় নিয়োজিত। সপ্তম আকাশে গিয়ে দেখতে পেলেন ফেরেশাগণের এক জামাত 'আস্‌সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহু' তসবীহ পাঠ করছেন। এরাও জন্মবধিই এই মোবারক তসবীহতে নিয়োজিত। এই স্থানে এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনের মধ্যে এরূপ একটি আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয় যে, আল্লাহ পাক যদি তাঁর উম্মতের জন্য ফেরেশতাগণের উপর্যুক্ত রূপ এবাদতের অনুরূপ এবাদত নির্ধারিত করতেন তবে কতইনা ভাল হতো!

হযরত নবী করীমের (সা.) সেই আকাঙ্ক্ষার আলোকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাত আসমানের ফেরেশতাগণের এবাদতরাশি নামাযের মধ্যে শামিল করে দিলেন এবং ফেরেশতাগণের সেই এবাদতের সম্মিলিত যে খায়র ও বরকত রয়েছে তাই নামাযীগণের জন্য নির্ধারিত করে দিলেন। সুতরাং যারা ঠিকমত পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করেন তাঁদের জন্য সাত আসমানের ফেরেশতাগণের সম্মিলিত এবাদতের সওয়াব দান করা হয়।

বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করে তার আমলনামায় দু'হাজার সিদ্দীকের অনুরূপ পুণ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। আর যদি সে ব্যক্তি পরবর্তী জোহর নামায আদায় করার আগে

www.pathagar.com

ইন্তেকাল করে যায় তাকে আল্লাহ পাক শহীদের মৃত্যু দান করেন। অনুরূপ যে ব্যক্তি জোহরের নামায জামাতের সাথে আদায় করে এবং আসরের নামাযের সময় হওয়ার আগেই মৃত্যু বরণ করে তাকে আল্লাহ পাক প্রতি রাকাতের বিনিময়ে বারো হাজার শহীদ এবং সিদ্দীকের অনুরূপ সওয়াব দান করেন। যে ব্যক্তি আসরের নামায জামাতের সাথে আদায় এবং মাগরেবের আগেই ইন্তেকাল করে তাকে আল্লাহ তা'য়ালা সে বছরের হজ্ব এবং ওমরার সওয়াব দান করে থাকেন। সে পরবর্তী নামায আদায় করার সময় হওয়ার আগেই যদি ইন্তেকাল করে তাহলে আল্লাহ পাক তাকে শহীদের অনুরূপ মর্তবা দান করেন। মাগরেবের নামায যে ব্যক্তি জামাতের সাথে আদায় করে তাকেও আল্লাহ পাক সে বছরের হজ্ব এবং ওমরার সওয়াব দান করেন। এশার সময় হওয়ার আগেই যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে সে শহীদের মর্তবা লাভ করবে।

যদি কেউ এশার নামায জামাতের সাথে আদায় করে তবে প্রতি রাকাতের বদলায় সে সেই পরিমাণ নেকী পাবে যে পরিমাণ নেকী হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে ছয় জন বন্দি ব্যক্তি মুক্ত করার বিনিময়ে পাওয়া যেতে পারে। আর যদি সে ব্যক্তি ফজর হওয়ার আগেই মৃত্যু বরণ করে তাহলে শহীদের দরজা লাভ করবে।

নামায তরককারীদের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মুমেন এবং কাফেরের মধ্যে ভেদরেখা হচ্ছে নামায ত্যাগ করা।

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরক করে সে কাফেরদের অনুরূপ পাপে জড়িয়ে গেল। (আল্লাহর পানাহ)!

হাদীস শরীফে আছে যে, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথারীতি আদায় করে সে অপরিমেয় নূর প্রাপ্ত হয় এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত থাকতে পারে। অপর দিকে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরক করে সে হাশরের ময়দানের নূর থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং নাজাত পাওয়ার জন্য তার অনুকুলে উপযুক্ত দলীল থাকবে না। সে ব্যক্তি কবর থেকে ফেরাউন, কারুন, হামান এবং উবাই ইবনে খলফ্দের জামাতভুক্ত এবং লানতের ভাগিদার হয়ে উঠবে।

www.pathagar.com

আয়াতুল-কুরসী, সূরা ফাতেহা এবং আরও কিছু সংখ্যক বিশেষ সূরা ও আয়াতের ফযীলত

বর্ণনা রয়েছে যে, আয়াতুল-কুরসী যখন নাযিল হয় তখন আরশে-আজীমের ফেরেশতাগণের মধ্য থেকে বিরাট একটি দল হযরত জিবরাঈলের (আঃ) সহগামী হয়ে আগমন করেছিলেন।

এসময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন যে, আমার বান্দাগণের মধ্যে যে ব্যক্তি আয়াতুল-কুরসী পাঠ করবে, তার আমলনামায় এই আয়াতের প্রতিটি হরফের মোকাবেলায় হাজারগুণ নেকী লেখা হবে। তদুপরি পাঠকারীকে আমার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণের কাতারে শামিল করে নিব।

● ফাতাওয়ায়ে-জহীরিয়াতে লেখা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার বাসস্থান থেকে বের হওয়ার সময় একবার আয়াতুল-কুরসী পাঠ করবে, আল্লাহপাকের ফেরেশতাগণ ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত সে ব্যক্তির হেফাজতের দায়িত্ব পালন করবেন। উপরন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্য মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে থাকবেন। অনুরূপ যে ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করার সময় একবার আয়াতুল-কুরসী পাঠ করবে, আল্লাহ পাক সে বান্দার যাবতীয় অভাব-অভিযোগ এবং তৎসহ যেসব বালা-মুসীবতে সে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তা দূর করে দিবেন।

● বর্ণিত আছে যে, বাগদাদ শহরে একজন বুযুর্গ বাস করতেন। একদিন আট-দশজন চোর সুযোগ বুঝে তাঁর বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। বুযুর্গের স্ত্রী শোয়ার আগে আয়াতুল-কুরসী পাঠ করে ঘরে ফুঁ দিয়ে রেখেছিলেন। আয়াতুল-কুরসীর বরকতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সব কয়টি চোরের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেল। ওরা তখন দিশাহারা হয়ে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগলো। বুযুর্গ জাগ্রতই ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? এখানে কী উদ্দেশ্যে এসেছ?

অনন্যোপায় হয়ে ওরা বলল, আমরা চুরি করার উদ্দেশ্যে বাড়ীতে প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের সবারই দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট

www.pathagar.com

হয়ে গেছে। ওগো আল্লাহর ওলী! দোয়া করুন যেন আল্লাহপাক আমাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। আমরা তওবা করছি। জীবনে আর এই পাপ কাজে লিপ্ত হবো না।

ওদের কাকুতি-মিনতি শুনে বুযুর্গ দোয়া করলেন। ফলে ওদের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো এবং ওরা তওবা করে চিরদিনের জন্য পাপের পথ থেকে বিরত হয়ে গেল।

● বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ আয়াতুল-কুরসী পাঠ করে মৃত ব্যক্তির জন্য ছওয়াব-রেছানী করে, তাহলে আল্লাহপাক সেই মৃতের কবরে নূর প্রবেশ করিয়ে দেন এবং যিনি পাঠ করেন তাকে অনেক বড় নেকীর ভাগী করেন।

● বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি দিবারাত্র আমার উম্মত সম্পর্কে চিন্তিত ছিলাম যে, ওরা আযাবে পতিত না হয়! হযরত জিবরাঈল যখন সূরা এখলাস নিয়ে আগমন করলেন তখন আমি অনেকটা চিন্তামুক্ত হয়েছি। কেউ যদি সূরা ইখলাস পাঠ করে তবে আরশে-আজীমের নীচে একজন ঘোষক এই মর্মে ঘোষণা দিতে থাকেন যে, মহান আল্লাহ তোমার সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। অতঃপর তোমার কোনো প্রয়োজন থাকলে বল তা পূরণ করা হবে।

● তফসীরের কিতাবে লেখা আছে যে, সূরায়ে-ফাতেহায় সাতখানা আয়াত রয়েছে। যে ব্যক্তি তা পাঠ করে সে যেন একাধিকবার কুরআন খতম করল। রাতের বেলায় একবার নিবিষ্ট মনে এই সূরা পাঠ করলে শবে-ক্বদরের এবাদতের ন্যায় ছওয়াব পাবে।

যে ব্যক্তি সূরা তাবারাকাল্লাযী বেশী করে তেলাওয়াত করবে, হাশরের ময়দানে এই সূরা সে ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে।

● কেউ যদি ফজর ও মাগরেব বাদ কুলহু আল্লাহু আহাদ তিন বার, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক তিনবার এবং কুল আউযু বেরাব্বিন-নাস একশত বার পাঠ করে তবে আল্লাহপাক সে ব্যক্তিকে প্রতারকের প্রতারণা, হিংসুকদের হিংসাজনিত ক্ষতি এবং জিন ও শয়তানের উপদ্রব থেকে রক্ষা করবেন।

www.pathagar.com

● কেউ যদি চায় যে, আল্লাহর নিকট তার ইবাদত-বন্দেগী কবুল হোক তাহলে সে যেন পাঠ করে– রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস্ সামীউল আলীম।

● যে ব্যক্তি দুনিয়া আখেরাতের নেকী এবং দোযখের আগুন থেকে মুক্তি কামনা করে সে যেন পড়তে থাকে, রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাতাঁও ওয়াকেনা আযাবাননার।

● যে ব্যক্তি এরূপ কামনা করে যে, জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রে যেন দৃঢ়পদ থাকে এবং কোনো অবস্থাতেই যেন শত্রু তার উপর প্রধান্য বিস্তার করতে না পারে, তাহলে যেন পাঠ করে– রাব্বানা আফরেগ আলাইনা সাবরাঁও ওয়া সাব্বেত আকদামানা ওয়ানসুর না আলাল্ ক্বাউমিল কাফেরীন।

● যে ব্যক্তি এরূপ আকাজ্ক্ষা করে যে, তার অন্তর যেন মজবুত থাকে এবং সব সময় আল্লাহ তা'য়ালার রহমত তার উপর বর্ষিত হতে থাকে তাহলে এই আয়াত পাঠ করতে থাকবে– রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা, বাদা ইয হাদাইতানা, ওয়া হাবলানা মিনলাদুনকা রাহমাতান্, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।

● কেউ যদি এরূপ আকাজ্ক্ষা করে যে, তার শুমার যেন আল্লাহ তালার প্রিয় পাত্রদের মধ্যে হয় তাহলে সে যেন নিয়মিত পাঠ করে– রাব্বানা ইন্নাকা জামেউন নাসা লে ইয়াউমিল লা রাইবা ফীহ্, ইন্নাল্লাহা লা ইউখলিফুল মী আদ।

● কারো যদি কোনো মূল্যবান বস্তু হারিয়ে যায়, কিংবা সন্তানাদি পালিয়ে যায় বা নিখোঁজ হয়ে যায়, অথবা চায় যে, তার সন্তান যেন নেক হয়, তাহলে নিয়মিত পড়বে– রাব্বি হাবলী, মিন লাদুনকা, যুররিয়াতান, তাইয়্যেবাতান, ইন্নাকা আনতাস্ সামীউদ্ দোয়া।

● কেউ যদি নেক বান্দাদের তুল্য মর্যাদা লাভ করতে চায় এবং হাশরের ময়দানে পূর্ণমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে চায়, তাহলে যেন নিয়মিত পাঠ করে– রাব্বানা আতেনা মা ওয়াআদতানা আলা রুসুলেকা, ওয়ালা তুখযে না ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ্, ইন্নাকা লা তুখলেফুল-মীআদ।

www.pathagar.com

● কেউ যদি জালেমদের কবজা থেকে মুক্তি চায় তবে পাঠ করবে- রাব্বানা আখরেজনা মিন হাযিহীল ক্বারিয়াতিয যালেমে আহলুহা ওয়াজআলনা মিন লাদুনকা ওয়ালিয়্যাও ওয়াজ আলনা মিনলাদুনকা নাছীরা।

● কেউ যদি চায় যে, তার ওপর যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত ও রহমত নাযিল হতে থাকে, তার রিজিকে প্রশস্ততা আসে এবং সে যেন কারো মুখাপেক্ষী না থাকে, তবে সে নিয়মিত পড়বে, রাব্বানা আনযেল আলাইনা মায়েদাতান মিনাস্ সামায়ে তাকুনু লানা ঈদান লে আওয়ালেনা ওয়া আখেরে না, ওয়া আয়াতুন মিনকা, ওয়ারযুক্বনা, ওয়া আনতা খাইরুর রাযেকীন।'

● কেউ যদি চায় যে, দুনিয়া ও আখেরাতে যেন সে জালেমদের দলভুক্ত না হয়, তাহলে নিয়মিত পড়বে, রাব্বানা লা-তাজআলা না ফেতনাতান লেক্বাউমিয্ যালেমীন।

● যে ব্যক্তি ফজর নামায বাদ দশবার পড়বে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়াহুয়াল হাইয়ুন্ লা ইয়ামুতু-আবাদান আবাদা, বে ইয়াদিহীল খাইরু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীরু। তবে আল্লাহ পাক তার আমলনামায় দশ হাজার নেকী লেখবেন এবং সমপরিমাণ পাপ তার আমলনামা থেকে মুছে ফেলবেন। অধিকন্তু সেইদিনটিতে সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার খাস তত্ত্বাবধানে থাকবে। আর শয়তান তার উপর কোনো প্রকার আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না।

● কোনো সময় যদি বিমর্ষতা সৃষ্টি হয় কিংবা কোনো আপদ-বিপদে সন্ত্রস্ততার পরিবেশ হয়ে যায়, তবে তিনবার পাঠ করবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আলীউল হাকীম!

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল কারীম।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতে ওয়াল-আরদে ওয়া রাব্বুল আরশিল আজীম।

এই দোয়াটি পড়ার পর আল্লাহর ইচ্ছায় মনে প্রফুল্লতা ফিরে আসবে।

www.pathagar.com

● কেউ যদি কোনো সমস্যায় পড়ে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ে এবং সমস্যাটির সমাধানের কোনো পথই দেখতে না পায়, তাহলে রাতের বেলায় পড়বে, ইয়া ফাত্তাহু, ইয়া ফাত্তাহু, ইয়া ফাত্তাহু।

আল্লাহর মেহেরবানীতে সমস্যাটির ত্বরিৎ সমাধান হয়ে যাবে। সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দোয়াটি পড়া অব্যাহত রাখতে হবে।

● বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আলী! পাঁচটি কাজ সম্পাদন না করে নিদ্রা যেয়ো না। প্রথমত মিসকীনদের মধ্যে চার হাজার দেরহাম সদকা করবে। দ্বিতীয়ত অন্তত এক খতম কুরআন পাঠ করবে। তৃতীয়ত জান্নাতের মূল্য পরিশোধ করবে। পঞ্চমত সমগ্র দাবীদারদের তুষ্ট করবে।

হযরত আলী (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতগুলি কাজ একরাতে সমাধা করা কিভাবে সম্ভবপর হবে?

হযরত নবী করীম (সা.) এরশাদ করলেন, শয়নের আগে চারবার সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। এতেই ফকীর-মিসকীনের মধ্যে চার হাজার দেরহাম সদকা দান করার তুল্য নেকি অর্জিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত: তিনবার সূরা এখলাস পাঠ করবে, এতে করে পূর্ণ এক খতম কুরআন পাঠ করার সমান নেকি অর্জিত হবে। তৃতীয়ত দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে। এর দ্বারা তোমার বেহেশতের মূল্য পরিশোধ হয়ে যাবে। চতুর্থত পাঁচবার সুবহানাল্লাহু ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলীয়্যিল আজীম, মাশাআল্লাহ কানা, মা লাম ইয়াশাউ লাম ইয়াকুন– পাঠ করো। এর দ্বারা তুমি হজ আদায় করার সমান নেকি লাভ করতে পারবে।

পঞ্চমত দশবার সুবহানাল্লাহা বেহামদিহী, ওয়া সুবহানাল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম ওয়া বেহামদিহী ওয়াসতাগ ফেরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লে যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি পাঠ করো, এতটুকুই তোমার জন্য এমন ফলপ্রসূ হবে, যেন তুমি সমস্ত দাবীদারকে তুষ্ট করে দিলে।

www.pathagar.com

মৃত্যুর বিভীষিকা

হযরত আনাস (রা.) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) একবার রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছিলেন, এমন কেউ আছে কি যারা শহীদের মর্যাদা পেতে পারে? বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি দৈনিক অন্যূন একুশবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে পারে। সে শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে।

আরও বলেছিলেন, যদি চতুষ্পদ জন্তুরা জানতে পারতো যে, তাকেও মরতে হবে, তাহলে ওদের কারো গায়ে চর্বি দেখতে পেতে না। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহপাক যখন মৃত্যুকে একটি মহিষের আকৃতিতে সৃষ্টি করে ফেরেশতাগণের সামনে হাজির করেছিলেন তখন ফেরেশতাগণের অনেকে এই বীভৎস চেহারা দেখে হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিলেন। হুঁশ আসার পর তাঁরা আরজ করলেন, মাওলা! এটি কি বস্তু?

আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, এটি মৃত্যু।

তাঁরা আরজ করলেন, একে আপনি কাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ বললেন, প্রত্যেক জীবনধারীর জন্য।

তারা আরজ করলেন, মাওলা! এই দুনিয়াকে আপনি কিসের জন্য সৃষ্টি করেছেন?

বললেন, দুনিয়া এজন্য সৃষ্টি করেছি, যেন আদমের সন্তানগণ এতে বসবাস করতে পারে।

তারা বললেন, আমাদের মনে এরূপ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, যাদের জন্য মৃত্যুর ন্যায় ভয়ানক বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা দুনিয়ার জীবনে কিভাবে মনোনিবেশ করবে?

তখন আল্লাহ রাব্বুল-আলামীন বললেন, এদের মধ্যে এমন সুদূরপ্রসারী আশা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা হবে যে, মৃত্যুর কথা তারা অবলীলায় ভুলে গিয়ে সংসার জীবনে মনোনিবেশ করবে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, 'তোমরা ভোগের আনন্দ বিনষ্ট করে দেয় যে বস্তু তাকে বেশী করে স্মরণ করো।' বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সে

www.pathagar.com

বস্তুটি হচ্ছে মৃত্যু। এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছিলেন যে, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। বলেছিলেন, বেশী করে মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে যেন আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুর কথা মনের মুকুর থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার মতো পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাক। যেন পার্থিব সহায়-সম্পদের কথা একেবারে ভুলে যাও। বেশী করে দোয়া করতে থাক, যেন মনের মাঝে দোয়া কবুল হওয়ার বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায়। বেশী করে নেয়ামতের শুকুর আদায় করতে থাক কেননা, শুকুরের বদলায় আল্লাহপাক নেয়ামত বাড়িয়ে দেন।

হযরত ওমর (রা.) প্রতিদিন সকালে উঠে বলতেন, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছি। হে মালাকুল মওত! এখন যে কোনো অবস্থায় তুমি আমার প্রাণ নিয়ে নিতে পারো।

হযরত ইবরাহীম আদহাম (রা.) কোথাও যাওয়ার জন্য রওয়ানা হওয়ার পর বারবার ঘরে ফিরে এসে দেখতেন যে, মৃত্যুর জন্য পরিপূর্ণ রূপে তৈরি হয়ে তিনি রওয়ানা হয়েছেন কি না?

কোনো একজন বুযুর্গ বলেছিলেন, কোনো বান্দা যখন মৃত্যুর কথা স্মরণ করে তখন আল্লাহপাক তাকে চারটি বিষয় দান করে সম্মানিত করেন। (১) হাশরের ময়দানে কঠিন পরিস্থিতি তার জন্য সহজ করে দেন। (২) দুনিয়ার প্রতি অপ্রয়োজনীয় আকর্ষণ তার মন থেকে দূর করে দেওয়া হয়। (৩) তার তওবা করার তওফীক হয় এবং গোনাহ থেকে সরে থাকা তার জন্য সহজ করে দেন। (৪) তার এবাদত-বন্দেগী কম হলেও আল্লাহপাক তার প্রতিদান অনেকগুণ বাড়িয়ে দেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন ওফাতের সময় উপস্থিত তখন হযরত জিবরাঈল তাঁর শিয়রের পাশেই বসা ছিলেন। নবী করীম (সা.) তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু উপস্থিত অন্য কারো তা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। তবে কথোপকথন তাঁদের কর্ণগোচর হচ্ছিল।

এক পর্যায়ে নবী করীম (সা.) বলেছিলেন, ভাই জিবরাঈল! তুমি আমার বন্ধু। কিন্তু এই কঠিন সময়টাতে তুমি আমার দিক থেকে মুখ

www.pathagar.com

ফিরিয়ে রাখছ কেন? হযরত জিবরাঈল জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার বন্ধু বলেই মুখ ফিরিয়ে রাখছি। আপনার বর্তমান এই কঠিন সময়ের অবস্থাটা দেখে আমি সহ্য করতে পারছি না। নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন, ঠিক মৃত্যুর সময়টিতে যে কষ্ট হয়, এই কষ্টের সামান্য অংশও যদি দুনিয়ার জীবিত মানুষগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে সম্ভবত সবারই মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়বে।

মৃত্যুপথ যাত্রীকে পরজীবনে সত্তরটি ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম ভয়াবহতা মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়।

একদিন হযরত ঈসা (আ.) নবী হযরত ইয়াহইয়ার পবিত্র মাযারের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর হুকুমে উঠে আসুন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত ইয়াহইয়া (আ:) কবর থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁর মাথার অর্ধেক চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। হযরত ঈসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, মৃত্যুর সময় তো আপনার মাথার কেশ কালো ছিল। এখন অর্ধেক চুল সাদা দেখতে পাচ্ছি কেন? হযরত ইয়াহইয়া (আ.) বললেন, যখন কানে গেল যে উঠে এসো, আমি মনে করলাম, সম্ভবত: হাশরের ময়দানে হাজির হওয়ার ডাক এসে গেছে! তাই ভয়ে-ত্রাসে মাথার অর্ধেক চুল সাদা হয়ে গেছে।

ঈসা (আ.) বললেন, আপনি কি চান যে, আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করে আপনাকে পুনরায় দুনিয়াতে নিয়ে আসি? হযরত ইয়াহইয়া (আ.) জবাব দিলেন, তোমার সাথে আমার আত্মীয়তার যে বন্ধন রয়েছে, সেই সম্পর্কের দোহাই দিয়ে বলছি, এরূপ দোয়া করো না। মৃত্যু যন্ত্রণার কষ্ট এখনও আমার কণ্ঠনালীতে অনুভূত হচ্ছে। এখন জীবিত হয়ে পুনরায় মৃত্যুর সম্মুখীন আমি হতে চাই না।

বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত মূসার (আ.) নিকট মালাকুল-মওত হাজির হয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি মালাকুল-মওত। আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। হযরত মূসা (আ.) বললেন, কিছুটা সময় দিন, একটু প্রস্তুত হয়ে নেই। এ সময় তাঁকে বলা হলো, একটি ছাগলের গায়ে হাত রাখুন, হাতের নীচে যতগুলো লোম আসবে, তত বছর আপনার আয়ু বাড়িয়ে দেওয়া হবে। হযরত মূসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কি হবে। বলা হলো, মৃত্যু।

www.pathagar.com

মূসা (আ.) বললেন, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই যদি অপরিহার্য হয়ে থাকে তাহলে এখনই তা হোক। আমি প্রস্তুত।

অতঃপর মালাকুল-মওত হযরত মূসার (আ.) হাতে একটি ফুল দিলেন। ফুলটি শুঁকার সাথে সাথে মূসার (আ.) রুহ অনন্তে মিলিয়ে গেলো। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি স্বপ্নে হযরত মূসার (আ.) সাক্ষাৎ লাভ করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মৃত্যু আপনার নিকট কেনম মনে হয়েছে? শুকনো কাঠের মধ্যে একটি পেরেক ঠুকলে এবং তা শক্তি প্রয়োগ করে বের করে আনলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় মৃত্যুর অবস্থাটা অনেকটা সেরকমই অনুভব করেছি।

বর্ণিত আছে যে, একটি পুরাতন কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হযরত ঈসা (আ.) দেখতে পেলেন, কবরবাসীর উপর আযাব হচ্ছে। হযরত ঈসা (আ.) দোয়া করলেন, মাওলা! তোমার এই বান্দাকে জীবিত করে দাও।

লোকটি যখন জীবিত হয়ে কবর থেকে বের হয়ে এলো, তখন হযরত ঈসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে তোমার উপর এই আযাব হচ্ছে? লোকটি জবাব দিল, একটা কিছু খাওয়ার পর খেলাল করার প্রয়োজন দেখা দিলে একজনের লাকড়ীর গাঁঠরি থেকে খেলাল করা যায় পরিমাণ কাঠের টুকরো মালিককে না বলে নিয়েছিলাম। সেই হকের কারণে আমি বিগত চার হাজার বছর যাবত এরূপ ভয়ানক সমস্যায় রয়েছি।

হযরত ঈসা (আ.) বললেন, শুধু একটি খেলালের জন্য যদি এরূপ আযাব হতে পারে, তবে যেসব লোক জুলুমের মাধ্যমে ঘরের খুঁটি বা কড়ি-বর্গা হাতিয়ে নেয়, তাদের শাস্তি কিরূপ হবে তা সহজেই অনুমেয়।

ঈসা (আ.) আবারো জিজ্ঞেস করলেন, মৃত্যু তোমার নিকট কেমন মনে হয়েছে? বিশেষত মৃত্যুকষ্ট কেমন ছিল? লোকটি বললো, চার হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এখনও মৃত্যু যন্ত্রণার কষ্ট অনুভব করছি।

তখন হযরত ঈসা (আ.) দোয়া করলেন, মাওলা! তোমার বান্দাদের জন্য মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ করে দাও।

www.pathagar.com

কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মৃত্যুযন্ত্রণা কেমন হবে? বলেছিলেন বড় বড় কাঁটাওয়ালা একটি বৃক্ষশাখা পেটের ভিতর ঢুকিয়ে তা অন্তনালীর মধ্য থেকে টেনে বের করলে যেরূপ যন্ত্রণা অনুভব হবে, রূহ মানব দেহ থেকে বের করে আনা তার চাইতেও কঠিন হবে।

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত ঈসা (আ.) তাঁর মাতা হযরত মরিয়মের কবরপার্শ্বে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মা! মৃত্যুযন্ত্রণা আপনার নিকট কেমন বোধ হয়েছে? কবর থেকে জবাব এলো, এখনও পর্যন্ত সেই যন্ত্রণার তীব্রতা দূর হয়নি।

এই জবাব শুনে হযরত ঈসা (আ.) আর কালবিলম্ব না করে একদিকে চলে গেলেন।

কবরের জীবন

বর্ণিত আছে যে, কবর তার মধ্যে প্রবেশকারীদের প্রতি চারটি বিষয়ে প্রস্তুতি নিয়ে আসার জন্য অহরত আওয়াজ দিতে থাকে। বলতে থাকে,

১. হে গাফেল! এখন তুমি যে আমিরী জীবনযাপন করছ, কবরের অসহায় জীবনের জন্য তার মধ্য থেকে কিছু সংগ্রহ করে নাও।

২. এখন আলো ঝলমল পরিবেশ থেকে কবরের ভয়ানক অন্ধকারের জন্য কিছু আলো সংগ্রহ করো।

৩. আজ তুমি বন্ধু পরিবৃত হয়ে আমোদ-উল্লাসের জীবনযাপন করছ, কবরের ভয়ানক একাকিত্বের জীবন সম্পর্কে চিন্তা করো এবং কিছু সঙ্গী-সাথী সংগ্রহ করতে চেষ্টা করো।

৪. এখন তুমি অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন-যাপন করছ। কবরের জীবনের কষ্টের কথা স্মরণ করে কিছু সম্পদ সংগ্রহ করে নাও। কারণ, সেখানে জিজ্ঞাসা করা হবে, কবরের দীর্ঘ নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য কী নিয়ে এসেছো?

আমীরুল-মুমেনীন হযরত ওসমান (রা.) কবরের কথা শুনলে রীতিমত বিচলিত হয়ে ক্রন্দন করতেন। কিন্তু হাশরের কথা বা দোযখের আলোচনা শুনে ক্রন্দন করতেন না। কিন্তু কবরের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন করতে শুরু করতেন।

www.pathagar.com

লোকেরা একদিন জিজ্ঞেস করলো, আমীরুল-মুমেনীন! আপনি দোযখের কঠিন আযাবের কথা শুনে বা হাশর ময়দানের ভয়াবহ অবস্থার কথা শুনলেও কাঁদেন না, কিন্তু কবরের প্রসঙ্গ আসলেই ক্রন্দন করেন। এর কারণ কি?

আমীরুল-মুমেনীন জবাব দিলেন, যদি দোযখে থাকি তবে সাথে আরও অনেকে হবেন। হাশরের ময়দানেও অগণিত সঙ্গী সাথী থাকবেন। কিন্তু কবরে তো আমার সাথে আর কেউ থাকবে না। ভয়ানক একটি একাকিত্বের মধ্যে আমার সময় কিভাবে কাটবে তা চিন্তা করেই আমি ভীত হয়ে যাই। কান্না সংবরণ করতে পারি না।

হাদীস শরীফে এরূপ বর্ণিত আছে যে, কবরস্থানের পাশ দিয়ে যখন কোনো মুসলমান ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে পথ চলে তখন কবরবাসীগণ ডেকে বলেন, হে গাফেল! আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তার ছিটেফোঁটাও যদি তুমি জানতে তাহলে তোমার গায়ে চর্বি সঞ্চিত হওয়া তো দূরের কথা, ভয়ে-ত্রাসে হাড় থেকে গোশত খসে খসে পড়তো।

হযরত আব্বাস (রা.) কর্তৃক এরূপ বর্ণিত আছে যে, ঈদ, জুমা, আশুরা, শবেকদর, শবেবরাত প্রভৃতি উৎসবের দিনে মৃতদের রূহ আপনজনদের দরজায় এসে এভাবে আওয়াজ দিতে থাকে যে, আমাকে স্মরণ করার মত কেউ কি আছ? কেউ কি আজ আমার অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে আমার জন্য রহমতের দোয়া প্রার্থনা করবে? আমার ভয়ানক অসহায়ত্বের কথাটা একটু উপলব্ধি করার মত কেউ আছ কি?

সে আরও বলতে থাকে, এই বাড়ি আমার ছিল, আজ তোমরা এসবের মালিক হয়েছ। তোমরা কি অনুগ্রহ করে আমার কথাটি একটু স্মরণ করবে না? এক সময় আমার কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু এখন আমার নাম মুছে গেছে। আজকের এই দিনে তোমরা কি আমার নামটা একটু উচ্চারণ করবে না।

হাদীস শরীফে আছে, কবর মৃত ব্যক্তির জন্য বেহেশতের একটি বাগান অথবা দোযখের একটি গর্তে পরিণত হয়। মা যেমন আদর করে শিশু-সন্তানকে বুকে চেপে ধরে, নেককার মুমিনদেরকে কবরের মাটি সেরূপ

www.pathagar.com

মমতার সাথে বরণ করবে। কিন্তু পাপীদেরকে কবরের মাটি এমনভাবে চেপে ধরবে যে, পাঁজরের একপাশের হাড্ডি অপর পাশে গিয়ে ঠেকে যাবে।

বর্ণিত আছে যে, জনৈক বুযুর্গ স্বপ্নে দেখলেন, তিনি একটি কবরস্থানে হাজির হয়েছেন। তাঁর চোখের সামনে কবরগুলি খুলে গেল। দেখতে পেলেন, কেউ ফুলের বিছানার আবার কেউ বা রেশমি বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে শুয়ে আছে।

বুযুর্গ আরজ করলেন, মাওলা! সবাইকে এক রকম বিছানা দেওয়া যেতো না? গায়েব থেকে আওয়াজ এলো, দেখ, এটা প্রতিদানের জায়গা। যে যেরূপ আমল করেছে, তাকে সেরূপ সম্মান দেওয়া হয়েছে।

এক ব্যক্তি হযরত নবী করীমের (সা.) খেদমতে আরজ করেছিল, দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা বড় জাহেদ কে?

বলেছিলেন, যে ব্যক্তি কবরের কথা কখনও ভুলে না, অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম ও বাক্যালাপ পরিত্যাগ করে এবং আগামীতে তার ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে, সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে।

এক বুযুর্গ বলেন, যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করতে চায় সে যেন কবরস্থানে চলে যায় এবং চিন্তা করে, এই নির্জন স্থানটির মাটির নীচে কত যোগ্য মানুষ পড়ে রয়েছে!

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, মুমিন ব্যক্তি যদি কবরের চাপের কথাটা স্মরণ করে, যে চাপের ফলে শরীরের হাড়-মাংস চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তবে সেটুকুই তো তার শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এরপর হিসাব-নিকাশ এবং দোযখের আগুনে জ্বলার বিষয়টি তো রয়েই যায়।

হাদীস শরীফে রয়েছে, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি দুনিয়াতে তিনটি বস্তু ছেড়ে যায়। দুটি দুনিয়াতেই থেকে যায় এবং একটি তার সাথে চলে যায়। পরিবার-পরিজন এবং ধন সম্পদ পিছনে থেকে যায়। আমলই একমাত্র বস্তু যা তার সাথে কবরে যায়।

বর্ণিত আছে যে, কবর প্রতিদিন অন্তত: সাতবার বিলাপ করে বলতে থাকে, ওগো যারা আমার দিকে আসছো, এটা একাকিত্বের স্থান। নিয়মিত

www.pathagar.com

কুরআন তেলাওয়াত করে এখানকার জন্য সঙ্গী সংগ্রহ করো। আমি এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার স্থান, রাত জেগে নামায পড় এবং এই ঘরের জন্য বাতি সংগ্রহ কর। আমি মাটির ঘর নেক আমলের দ্বারা এখানকার বিছানা সংগ্রহ করো। আমার ভিতর সাপ-বিচ্ছু বাস করে, স্বর্ণের টুকরো সদকা করে ওদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করো। আমি খুবই সংকীর্ণ একটা ঘর। আমার ভিতরে প্রবেশ করার সাথে সাথে মুনকার-নেকীরের সওয়াল শুরু হবে। সুতরাং যতক্ষণ মাটির উপর আছ ততক্ষণ বেশি করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ জিকির করে নিজেকে জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে নাও।

বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সঙ্গে সঙ্গেই কবরের ভিতরে মুনকার-নকীর নামের দুজন ফেরেশতা হাজির হন এবং মৃত ব্যক্তিকে বসিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেন, তোমার উপাস্য প্রভু কে? মৃত ব্যক্তি যদি মুমিন হয় তবে বলে, আমার উপাস্য আল্লাহ। অতঃপর প্রশ্ন করে, তোমাদের নিকট যে নবী প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? মুমিন ব্যক্তি জবাব দেয়, আমার নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর প্রশ্ন করা হয়, তোমার দ্বীন কি? মুমিন জবাব দেয়, আমার দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। এরূপ প্রশ্নোত্তর শেষ হওয়ার পর তার কবরের সাথে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দিয়ে বলা হয়, তোমার জন্য নির্ধারিত স্থানটি দেখে নাও এবং নববধূর ন্যায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও।

অপরদিকে মৃতব্যক্তি যদি কাফের-মুনাফেক বা পাপিষ্ঠ হয়, তাহলে বসানোর পর মুনকার-নকীর যখন সওয়াল করতে শুরু করে তখন সে শুধু বলতে থাকে, আমি কিছুই জানি না। তখন ফেরেশতাগণ তাকে আগুনের ছড়ি দিয়ে প্রচণ্ড মারপিট শুরু করেন। সে তখন এমন চীৎকার করে যে, তার সেই ভয়ঙ্কর চীৎকারের শব্দ মানুষ ও জ্বিন জাতি ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টজীবের কানে গিয়ে পৌঁছে। অতঃপর বলা হয়, সম্বিতহারা অবস্থায় সাপ-বিচ্ছুর মধ্যে পড়ে থাক। ওরাই তোমাকে কুড়ে কুড়ে খাবে। আর এটাই তোমার ভাগ্যলিপি।

বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত আয়েশা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে

www.pathagar.com

দিন কবরের চাপ ও মুনকার-নকীরের সওয়াল-জবাবের কথা শুনেছি, সেদিন থেকে আমার নিকট দুনিয়ার সবকিছু বিস্বাদ হয়ে গেছে। শুধুই চিন্তা আসে যে, নাজানি আমার কি দশা হয়! নবী করীম (সা.) বললেন, আয়েশা! মুমিনকে কবর এভাবে চাপ দিবে যেমন মমতাময়ী মা সোহাগভরে সন্তানকে বুকে চেপে ধরেন। কিন্তু হে আয়েশা! কাফেররা কবরের চাপে এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হবে, যেন ডিমের উপর ভারি পাথর পতিত হলে তা চূর্ণ হয়ে যায়!

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হযরত ওমরকে (রা.) প্রশ্ন করেছিলেন, মুনকার-নকীরের সামনে তুমি কি করবে?

ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, মুনকার-নকীর কি?

নবী করীম (সা.) এরশাদ করলেন, এরা দু'জন ফেরেশতা, এদেরকে কবরের পরীক্ষক রূপেও অভিহিত করা হয়। এরা ভয়ঙ্কর ছুরত নিয়ে কবরে হাজির হবেন। এদের দাঁত থেকে আগুন বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। দুই চোখ রক্তবর্ণ, শব্দ বজ্রের ন্যায়, দুই পা আগুনের দুটি খাম্বার মত। হাশরের ময়দানে যত মানুষ থাকবে, সবে মিলে চেষ্টা করেও ওদেরকে সামান্য একটু সরাতে পারবে না। এরাই মৃত ব্যক্তির নিকট হাজির হয়ে প্রশ্ন করবে, তোমার উপাস্য কে? মৃত ব্যক্তি যদি মুমিন হয় তবে বলবে, আমার উপাস্য আল্লাহ।

অতঃপর জিজ্ঞেস করবে, তোমার দ্বীন কি?

মুমিন ব্যক্তি জবাব দিবে, আমার দ্বীন ইসলাম।

অতঃপর প্রশ্ন করবে, তোমার নিকট প্রেরিত পয়গম্বর কে ছিলেন? মুমিন ব্যক্তি জবাব দিবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। ফেরেশতা দু'জন বলবেন, তোমার জবাব সঠিক হয়েছে। যদি মৃত ব্যক্তি কাফের হয়, তবে ফেরেশতাদের প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে বলবে, আমি তো কিছুই জানি না।

তখন ফেরেশতা মৃত ব্যক্তির উপর এরূপ আঘাত করবে যে, তার সমস্ত দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এ সময় মৃত ব্যক্তি এমন চীৎকার করবে যে, এই চীৎকারের শব্দ জ্বিন এবং ইনসান ছাড়া আর সবারই কর্ণগোচর হবে ও সকলে এ ব্যক্তির উপর লানত করতে থাকবে।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুনকার-নকীরকে আমরা কি অবস্থায় দেখব?

বললেন, ঠিক এখন যে অবস্থায় তুমি রয়েছো ঠিক এই অবস্থাতেই অর্থাৎ তোমার হুঁশ-আকল সব কিছুই ঠিক থাকবে।

তারপরও ওমর ফারুক (রা.) মন্তব্য করেছিলেন, আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন, সঠিক জবাব দিতে পারি কি না?

ওফাতের পর হযরত ওমরকে (রা.) স্বপ্নে দেখে তাঁর এক বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন, মুনকার-নকীরের সামনে আপনার অবস্থা কেমন হয়েছিল?

বলেছিলেন, আমাকে কবরে রেখে যাওয়ার পরই ভয়ঙ্কর চেহারা বিশিষ্ট দুই ফেরেশতা এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার উপাস্য কে? তখন আমার মনে এমন ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল যে, যদি আল্লাহ্ তা'য়ালার খাস রহমত না হতো, তবে হয়ত আমি জবাব দিতে পারতাম না।

জান্নাত ও তার নেয়ামতসমূহ

জান্নাত চিরস্থায়ী, ধ্বংস হবার নয়, তার নায-নেয়ামত, ভোগ-বিলাস ও সকল মঞ্জিল মুমিনের জন্যে প্রতিদান স্বরূপ। বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের দেওয়াল স্বর্ণ ও চান্দি দ্বারা নির্মিত, মাটি জাফরান ও মিশকের।

উল্লেখ আছে, জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী দলের সূরত হবে চৌদ্দ তারিখের চাঁদের উজ্জ্বলতার মত, তাদের প্রত্যেককে একশত মানুষের শক্তি প্রদান করা হবে, খানা-পিনা, নাক-মুখের ময়লা ও থু থু এবং পেশাব-পায়খানাসহ মানবিক কোনো প্রয়োজন সৃষ্টি হবে না, জান্নাতী লোকদের শরীর থেকে মিশকের মত সুঘ্রাণ নির্গত হবে।

উল্লেখ আছে, জান্নাতী হুররা দেখতে ইয়াকুত ও মারজানের মত হবে। তাদের চেহারার উজ্জ্বলতা দৃষ্টি শক্তিকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। তারা জান্নাতী পোশাকে আয়না অপেক্ষা অধিক স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হবে। মামুলী একজনের গায়ের উজ্জ্বলতা মাশরিক ও মাগরিবকে আলোকিত করে তুলবে। প্রত্যেক হুরই সত্তুর তা কাপড়ের পোশাকে সজ্জিত থাকবে যার

www.pathagar.com

সূক্ষ্মতার দরুন তাদের রৌপ্য সদৃশ পায়ের গোছা পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হবে। জান্নাতে প্রত্যেক মুমিনই হযরত আদম (আ.)-এর মত লম্বা-চওড়া হবে, যুবাকালে ঈসা (আ.) যেমন ছিলেন, ঠিক সেই মত হবে। সব বয়সের লোককেই দেখতে তেত্রিশ বছর বয়সী মনে হবে। তারা কখনো বৃদ্ধ হবে না। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মত সুন্দর হবে, কণ্ঠ দাউদ (আ.)-এর মত হবে।

উল্লেখ আছে, জান্নাতী রমণীরা সকল প্রকার নাজাসত থেকে পবিত্র থাকবে, নাক মুখের ময়লা ও থু থু থেকেও পবিত্র থাকবে, সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা, ঈর্ষা ও দুশ্চরিত্রতা থেকে মুক্ত থাকবে, কেউ কখনো অসুস্থ হবে না।

দুনিয়ার রমণীরা জন্মসূত্রে পানি, মণি ও রক্তের সাথে সম্পৃক্ত, জান্নাতী হুরদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা মিশক, জাফরান দ্বারা পয়দা করেছেন, আবেহায়াত দ্বারা খামির তৈরি করেছেন। তাদের সৌন্দর্যের দরুন হাড্ডির শিরা-উপশিরা পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হবে।

হাদীসে আছে, গভীর অন্ধকার রাতে যদি কোন হুর তাঁর কনিষ্ঠ আঙ্গুলকে দুনিয়ায় প্রকাশ করেন তাহলে তার দ্বারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে, মুখের এক ফোঁটা লালা সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও তারা পৃথিবীর নারীকুলের সেবিকা হিসেবে থাকবে। জান্নাতী হুরদের সৌন্দর্য সৃষ্টিগত, পৃথিবীর নারীদের সৌন্দর্য, দু'ধরনের। এক. সৃষ্টিগত। দুই. প্রতিদানী। দুনিয়ায় তাঁরা নানা ধরনের কষ্টক্লেষ সহ্য করার কারণে এদের এ প্রতিদান, জান্নাতী হুরদের নিকট তাঁরা দুনিয়ার সম্রাজ্ঞীর মত এবং হুররা হবেন তাদের বাঁদী তুল্য।

হাদীস শরীফের রেওয়ায়েত, জান্নাতী নারীরা তাদের স্বামীর কাছে এত সৌন্দর্যপূর্ণ ও পবিত্র হবে যার পবিত্রতায় ও স্বচ্ছতার মধ্যে তাঁদের জিগার-কলিজা স্বামীদের চোখে আয়না সদৃশ্য এবং পুরুষদের কলিজা তাঁদের জন্যে আয়নার মত হবে।

একটি হাদীসে আছে, জান্নাতী নারীদের মধ্যে দুনিয়ার নারীরা সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হবেন। দুনিয়ায় কষ্টক্লেশ সহ্য করার কারণে তাদের এ

www.pathagar.com

মর্যাদা। দুনিয়ার নারীদের মত জান্নাতী হুররা জান্নাতী নারীদের প্রতি ঈর্ষা করবেন না।

উল্লেখ আছে, জান্নাতী ফল দু'ধরনের হবে। এক. দুনিয়ায় যা ভক্ষণ করা হয়েছে। দুই. যা কোনো দিন কেউ দেখেনি ও ভক্ষণ করেনি। অবশ্য জান্নাতী ফলের পার্থক্য হলো তার কোনো দানা, কাঁটা এবং চামড়া থাকবে না। পরিষ্কার করার অথবা ছিলানোর কোনো প্রয়োজন হবে না, সরাসরি ভক্ষণ করা যাবে। রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি হবে না। মুমিন তাঁর ইচ্ছামত ভক্ষণ করতে পারবেন। দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় বিনা কষ্টে ইচ্ছা করলেই সরাসরি মুখে এসে পড়বে। তাবৎ ফলই তাদের ফরমাবরদারী করবে, কোনোটা খাওয়ার ইচ্ছা না হলে তাৎক্ষণিক আর একটি এসে উপস্থিত হবে, সেখানে নেয়ামতের কোনো কমতি নেই এবং তা কখনো শেষ হবার নয়। দুনিয়ার প্রতিটি ফলের এক ধরনের স্বাদ রয়েছে। কিন্তু জান্নাতী প্রতিটি ফলের মধ্যে সত্তর রকমের স্বাদ থাকবে। সেখানকার ফল খাবার দরুণ ক্ষুধা ও পিপাসা মিটে যাবে, সেখানে কারোর ক্ষুধা ও পিপাসা লাগবে না। জান্নাতের এসব নেয়ামতই কেবল ভোগ-বিলাসিতা ও আনন্দের জন্যে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে জান্নাতে চারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে। একটি দুধের, দ্বিতীয়টি মধুর, তৃতীয়টি শরাবের এবং চতুর্থটি পানির। কিছু সংখ্যক আলেম বলেন, প্রস্রবণ একটি হবে, কিন্তু সেখানে দুধ, মধু, শরাব ও পানি থাকবে। একটি অপরটির সাথে সংমিশ্রণ হবে না।

এক হাদীসে আছে, জান্নাতের শরাবে কাফুরের সুঘ্রাণ থাকবে, দুনিয়ার শরাবের মত টক ও মত্ততা হবে না। জান্নাতের কাফুর সংমিশ্রিত শরবতের একটি নহর প্রবহমান থাকবে, যা মুমিনের হুকুম তামিল করবে, যেভাবে প্রবাহের ইচ্ছে করবে সেখানে প্রবাহিত হবে, দুনিয়ার গরম, ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির মত নয়। কথিত আছে, জান্নাতী হাওয়া বসন্তকালীন প্রভাতের হাওয়ার অনুরূপ হবে। গরম, ঠাণ্ডা হবে না, হবে না দিন-রাতের হাওয়ার মত। জান্নাতী খাদেমদের বয়স তরুণ সাদৃশ্য। সেখানকার খাবার প্রয়োজন

www.pathagar.com

মোতাবেক, কম বেশি নয়, যেন কম হলে আফসোস ও বেশি হলে অপচয়ের সুযোগ না থাকে।

একথা স্পষ্ট যে শরাবের স্বাদ এতেই রয়েছে, প্রয়োজন মোতাবেক পান করা। এতে সংজ্ঞাহীনতার অবকাশ নেই, নেই বমি হওয়ার কোন সুযোগ। টগবগ করবে না, থাকবে না কোনো দুর্গন্ধ, বরং মনঃমুগ্ধকর, এমনই হবে জান্নাতী শরাব।

বর্ণিত আছে, জান্নাতীরা জান্নাতী আসনে বসে থাকবে, পক্ষিকুল তাদের সামনে এসে 'তুবা' নামক বৃক্ষের ডালে বসে নেহায়েত মিষ্টি মধুর কণ্ঠে বলবে, জান্নাতের এমন কোনো প্রস্রবণ বাকী নেই যার স্বাদ গ্রহণ করিনি। এমন কোনো শরাব নেই যা পান করা হয়নি। এমন কোনো লীলাভূমি বাকী নেই যা অতিক্রম করিনি। আমার স্বাদ অসাধারণ। পক্ষিকুলের অমন তারিফ শুনে মুমিনরা তাকে খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পাখিটি তার দস্তরখানে ভুনা অবস্থায় এসে উপস্থিত হবে। মুমিন তাঁর চাহিদামত ভক্ষণ করবেন। এরপর আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে পাখিটি জীবিত হয়ে উড়ে যাবে এবং অপরের সামনে সগর্বে বলবে, আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান কে আছে, আল্লাহর এক প্রিয় বান্দা আমাকে তার লোকমা হিসেবে গ্রহণ করেছেন! তারপর পুনরায় সে তার আপন স্থানে বসে পূর্বের ন্যায় বলতে থাকবে। তফসীর গ্রন্থে আছে– জান্নাত সপ্ত আসমানে আল্লাহ তা'য়ালার আরশের নিচে ছাদের মত, সকল জান্নাতে তার ছায়া বিস্তৃত। সূর্যের আলো থেকে মুক্ত দুনিয়ার ছায়ার মত নয়।

কথিত আছে, জনৈক বৃদ্ধা নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। নবী করীম (সা.) তাঁকে দেখে বললেন, বৃদ্ধা মহিলা কখনো জান্নাতে যাবে না। শুনার পর সে ক্রন্দন করতে লাগলো। উম্মত-জননী হযরত আয়েশা (রা.) নবীজির নিকট এসে বললেন।

নবীজি বললেন, আয়েশা! তুমি কি শোন নি যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'য়ালা সকল নারীকে বাকেরা ও যুবতী হিসেবে উপস্থিত করবেন। বৃদ্ধা থাকার অবকাশ নেই। তখন মহিলাটি আনন্দিত হলো। এটি নবীজির মজাক ছিলো। জান্নাতীদের সোয়াব ও প্রতিদানের সীমারেখা পরিমাপ করা

www.pathagar.com

অসম্ভব। তার মধ্যে একটি 'মুলকেকাবীর' অসাধারণ রাজত্ব। নবী করীম (সা.)-এর নিকট লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত দিবসে 'মুলকেকাবীরা' কেমন হবে?

বললেন, প্রত্যহ আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে ফেরেশতা হাদীয়া-তোহফা, উপঢৌকন নিয়ে মুমিনদের নিকট আসবে। প্রত্যেক মুমিনের মহলের সত্তরটি স্থানে প্রহরী থাকবে, ফেরেশতা মহলের প্রতিটি প্রহরীর নিকট অনুমতি কামনা করবেন। অতঃপর অনুমতি সাপেক্ষে মুমিনের সাথে সাক্ষাৎ ও উপঢৌকন পেশ করবেন। বস্তুত এর চেয়ে বড় প্রতিদান আর কী হতে পারে?

এ ব্যাপারে ভীত থাকা যে, দুনিয়া থেকে মুসলমান হয়ে যাবো নাকি কাফির অবস্থায়?

দুনিয়া থেকে মুসলমান অবস্থায় পরপারে গমন করা ফরজ। বান্দা যখন কুফরী ও অন্যান্য গোনাহ থেকে দূরে সরে থাকে, ঈমানের আলো দ্বারা যখন সে আলোকিত থাকে তখন মৃত্যুর সময় তাকে দুজন ফেরেশতা সুসংবাদ দিতে থাকেন। তাঁদের একজন বলতে থাকেন, ঈমানহারা হবার ভয় করো না। অবশ্যই আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন। অনুগ্রহ করে তোমাকে তিনি নাজাত দিয়ে দিবেন। বান্দা ফেরেশতাদ্বয়ের এ সুসংবাদে খুশি হয়ে যায়। এক বুযুর্গ বলেছেন, মোমেন পরজীবনে গিয়ে সত্তরটি ভয়ের সম্মুখীন হবে। প্রত্যেকটি ভয় এমন হবে যেটা পূর্বের ভীতি ভুলিয়ে দিবে। মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসবে তার কর্ণে দুটি সুসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হবে। তাহলো, তুমি ভয় করবে না। চিন্তিত হবে না। তুমি সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ, যেগুলি সম্পর্কে তুমি চিন্তিত ছিলে। যখন বান্দা এ সুসংবাদ পাবে তখন সে বলবে, এখন আমার কোনো ভয় নেই। কেননা আমাকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তুমি নিরাপদ।

হযরত খাজা হাসান বছরী (রহ.) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ইজ্জত ও জালালের কসম খেয়ে বলেন, আমি আমার বান্দাদের উপর একই সাথে দু'টি ভীতি একত্রিত করবো না। আবার একই সাথে দুটি নিরাপত্তাও

www.pathagar.com

একত্রিত করবো না। যে বান্দা দুনিয়াতে আমাকে ভয় করতে থাকবে তাকে কিয়ামতের দিন ভয়-ভীতিহীন করে দেবো। আর যে বান্দা দুনিয়াতে আমাকে ভয় করবে না তাকে কিয়ামতের দিন লজ্জিত করবো। আজ দুনিয়াতে যে ভীত, কিয়ামতের দিন সে থাকবে ভয় ভীতিহীন, যে দুনিয়াতে থাকবে ভীতিহীন কিয়ামতে সে ভীত থাকবে।

হযরত হাসান বছরী (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, বনি-ইসরাঈলের ৭০ জন যাহেদ দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গ ছিলেন। সে যামানায় পরহেযগারী ও ইবাদত-বন্দেগীতে তাদের ন্যায় অন্য কেউ ছিল না।

সে যুগের পয়গম্বরের উপর অহী আসে যে, এ সত্তরজন যাহেদ সকলই দুনিয়া থেকে কাফির অবস্থায় গিয়েছে। সে যুগের পয়গম্বর আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, এমন কেন হলো? জবাব আসল, সে লোকেরা তাদের কাজের শেষ পরিণতি সম্পর্কে নির্ভয় ছিল। ভয় করতো না।

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি নিজের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে ভয় করে না সে আমার দলভুক্ত নয়। (অর্থাৎ আমার পছন্দনীয় ব্যক্তি নয়)। বর্ণিত আছে যে, যখন বান্দার মৃত্যু নিকটবর্তী হয় তখন তার অবস্থা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তার মাল সম্পদ ওয়ারিশদের হক। জান মালাকুল মওতের। গোস্ত পোকা মাকড়ের। হাড্ডি হলো মাটির। ইবাদত, আনুগত্য এবং সকল প্রকারের নেকীসমূহ দাবীদারদের। অর্থাৎ মাল সম্পদ উত্তরাধিকারীরা নিয়ে যাবে। প্রাণ মালাকুল মওত নিয়ে নেবে। শরীরের গোস্ত পোকা-মাকড় খেয়ে ফেলবে। হাড্ডিসমূহ খাবে মাটিতে। ইবাদত বন্দেগী ও নেকীসমূহ দাবীদারগণ নিয়ে যাবে। আল্লাহ্ না করুন এমন যেন না হয় যে, ঈমানটি শয়তান নিয়ে যায়!

বর্ণিত আছে যে, হযরত সুলাইমান দারানী (রহ.) যখন কোনো অগ্নিপূজককে দেখতেন তখন বেহুঁশ হয়ে যেতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, হে বুযুর্গ! আপনি কোনো অগ্নিপূজক দেখলে বেহুঁশ হয়ে যান কেন? তিনি জবাবে বললেন, এভয়ে আমি বেহুঁশ হয়ে যাই যে, আমার অবস্থা যেন তার মত না হয়।

হযরত খাজা ছুফিয়ান সাওরী (রহ.) রাতের প্রথম অংশ থেকে শেষ রাত পর্যন্ত কাঁদতে থাকতেন। তাঁকে এভাবে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করা

www.pathagar.com

হলে তিনি বলেন, এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি যার কাছে লোকেরা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এলম শিখেছে। বছরের পর বছর খানায়ে-কাবার প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করে যখন তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন কাফের অবস্থায় গেলেন। এত ইবাদত-বন্দেগী করার পরও তার শেষ পরিণতি এমন খারাপ হয়। আমি ভয় করছি আমার অবস্থা কেমন হবে? আমার কান্না কাটির কারণ এটাই।

হযরত খাজা মুয়াজ নফতী (রহ.) অব্যাহতভাবে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ, আমার মৃত্যুর ৩ দিন পূর্বে আমার জ্ঞানকে তুমি উঠিয়ে নিও। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে বুযুর্গ! এ কেমন দোয়া? জবাবে বললেন, শেষ পরিণতি ভালো যেন হয় সে জন্য এ দোয়া করছি। যদি মৃত্যুর সময় এমন কোনো শব্দ যবান থেকে বের হয়ে পড়ে যার জন্য আমি জিজ্ঞাসিত হবো, তখন আমাকে পাগলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তখন পাগলামির কারণে। আমি মাজুরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে যাবো।

হযরত খাজা আবু বকর (রাহ.) কে তাঁর ইন্তেকালের পর লোকেরা স্বপ্নে দেখল। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে বুযুর্গ আপনার অবস্থা কেমন? জবাবে বললেন, খুবই পেরেশান আছি। জিজ্ঞেস করা হলো, কেন? জবাবে বললেন, প্রত্যেক ১০টি জানাযা (লাশ) যা কবরস্থানে দাফন করা হয় তার মধ্যে শুধু একজনই ঈমানদার পাওয়া যায়।

একজন কাফন চোর হযরত খাজা হাতেম (রহ.)-এর মজলিসে তাওবা করে। খাজা সাহেব (রহ.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কয়টি কবরের কাফনের কাপড় তুমি চুরি করেছ? সে জবাব দিল, সাত হাজার কবরের কাফন চুরি করেছি। খাজা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, এতগুলো কাফনের কাপড় তুমি কত বছরে চুরি করলে? সে বলল, বিশ বছর সময়ে।

খাজা সাহেব (রহ.) বেহুঁশ হয়ে গেলেন, কিছু সময় পর হুঁশে আসলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ সাত হাজার কবরবাসী-মুসলমান ছিলেন নাকি কাফির? সে বলল মুসলমান ছিল। খাজা সাহেব (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন আমাকে বলো যে, তুমি কয়জনকে এমতাবস্থায় পেয়েছ যাদের চেহারা কেবলার দিক থেকে ফিরে গিয়েছে। সে বলল এটা জিজ্ঞেস

করবেন না। বরং এটা জিজ্ঞেস করুন যে, কয়জনের চেহারা কেবলামুখী ছিল। অতঃপর সে বলল, ওই সাত হাজার কবরের মধ্য হতে শুধু তিনশত ব্যক্তির চেহারা কেবলামুখী ছিল। বাকীদের চেহারা কেবলার দিক হতে ফিরে গিয়েছিল। হযরত খাজা হাতেম (রহ.) আবার বেহুঁশ হয়ে গেলেন। যখন হুঁশে আসলেন, বললেন, এ নছিহতই আমার জন্য যথেষ্ট।

হযরত খাজা ফুজাইল আয়াজ (রহ.) হযরত খাজা দাউদ তায়ী (রহ.) কে দেখলেন যে, তিনি শুকিয়ে কাঁটার ন্যায় চিকন হয়ে গেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনি কেন এভাবে কান্নকাটি করছেন? জবাবে বললেন, আটটি বস্তু এমন রয়েছে যেগুলো আমাকে পানাহার ছাড়তে বাধ্য করেছে। জিজ্ঞেস করলেন, সে আটটি বস্তু কি? বললেন, প্রথম বিষয় হলো আমার খাতেমা অর্থাৎ শেষ পরিণতি ইসলামের উপর হবে নাকি কুফরের উপর।

আমার কাফনের কাপড়ের মুষ্টি ইসলামের উপর বাঁধা হবে নাকি কুফরীর উপর। দ্বিতীয়ত যখন আমাকে কবরে রাখা হবে তখন আমার কবর জান্নাতের বাগান থেকে একটি বাগান হবে? ন্যকি জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্য থেকে একটি গর্তে পরিণত হবে।

তৃতীয়ত যখন মুনকার-নকীর ফেরেশতাদ্বয় আমার কাছে প্রশ্ন করবে তখন সঠিক উত্তর দিতে পারবোকি না! চতুর্থত যখন কবর থেকে বাইরে বের হয়ে আসব তখন আমার চেহারাটি সাদা হবে নাকি কালো?

পঞ্চমত যখন কবর থেকে উঠে আসব তখন বুরাকে আরোহণ করে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে নাকি জাহান্নামের দিকে? ষষ্ঠত কেয়ামতের দিবসে যখন আমলনামা বের করা হবে তখন এটি ডান হাতে দেয়া হবে নাকি বাম হাতে! সপ্তমত যখন আমার হিসাব নেয়া শুরু হবে তখন হিসাব দিতে পারব কিনা। অষ্টমত কিয়ামতের দিবসে দুটি রাস্তা হবে। একটি জান্নাতের রাস্তা অপরটি জাহান্নামের রাস্তা। তখন আমাকে জান্নাতের রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে নাকি জাহান্নামের রাস্তায় হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে'?

www.pathagar.com

জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া ও জাহান্নামে প্রবেশ

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, দুনিয়া হতে পরপাড়ে পাড়ি জমানোর ক্ষেত্রে যার কোনো ভীতি নেই, নেই মুনকির ও নকিরের প্রশ্নের কোনো ভয়, অথচ আর সব বিষয়ে পূর্ণ সচেতন; তার কোনো ভাবনাই নাই আগত কিয়ামত দিবসের পর কি হবে তার ঠিকানা– সে আমার তরিকার বহির্ভূত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তাঁর মউতের প্রাক্কালে ক্রন্দন করছিলেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? জবাবে বললেন, আমি এমন পথের যাত্রী যে পথ এর পূর্বে আর কখনো অতিক্রম করিনি। সুতরাং জানি না আমি কাদের সঙ্গী হবো (নবী, শহীদ না কি কাফিরের সাথে দোযখে অবস্থান করব)।

কথিত আছে, খলীফা হারুনুর রশীদকে হযরত ইবনে সাম্মাক (রহ.) বললেন, আমাকে ওছিয়ত করা হয়েছে যে, রাস্তা এবং স্থান দুটি। একটি বেহেশত অপরটি দোযখ। জানি না বেহেশতে যাবো না কি দোযখে। এরপর হারুনুর রশীদ সংজ্ঞাহীন ও মূর্ছা যান। লোকেরা তাঁর কাছে ভীড় জমাতে থাকলে, হযরত ইবনে সাম্মাক বললেন, তাঁকে মরতে দাও! এরপর হারুনুর রশীদ এর সংজ্ঞা এলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি অমন করলেন কেন? জবাব দিলেন, তোমার জন্যে গর্বের বিষয় হবে যেন লোকেরা তোমার সম্পর্কে বলেন, খলীফা আল্লাহর ভয়ে ও দোযখের ভীতিতে ইন্তেকাল করেছেন!

বর্ণিত আছে, হযরত সাবেত বানানী (রহ.) জনৈক মহিলার উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তোমাকে পেতে চাই।

মহিলা বললো, সাবেত! মউত সম্পর্কে কি তোমার কোনো ভাবনা নেই, মুসলমান অবস্থায় মরবে নাকি কাফির? মুনকির-নকির এবং পুলসিরাত সম্পর্কে কি ধারণা? রাস্তা কেবল দুটি; একটি বেহেশতের অপরটি দোযখের। কি নিশ্চয়তা আছে তুমি বেহেশতে যাবে? তারপর খাজা সাবেত বানানী (রহ.) ক্রন্দন করতঃ অপরাগতার কথা স্বীকার করলেন।

www.pathagar.com

জনৈক বাদশাহ একজন খোদাভীরু আল্লাহ ওয়ালাকে বললেন, আমাকে ওছিয়ত করুন। সেই নেক ব্যক্তি বললেন, বেহেশত কেবল নেক্‌কারদের জন্যে, সাধ্যানুযায়ী নেক কাজ করো। এবং দোযখ পাপাচারীদের জন্যে, তা থেকে সচেতনভাবে দূরে থাকতে চেষ্টা করো।

আমীরুল মুমিনিন হযরত আলীর (রা.) বাণী ঃ বেহেশত আনুগত্যশীলদের জন্যে, হোক সে হাবশী গোলাম এবং দোযখ পাপাচারীদের জন্যে হোক সে কোরায়শী সম্রাট।

বিজ্ঞ জ্ঞানীদের বাণী, বেহেশত হতে বঞ্চিত হওয়া মুছিবতের সামিল, কে জানে কোন মুছিবত সর্ববৃহৎ।

বেহেশত হতে বঞ্চিত হওয়া নাকি দোযখে প্রবেশ।

কথিত আছে, দুনিয়া ব্যস্ততার ঘর, এটা বিভিন্ন অবস্থায় অতিক্রম করতে হয়। দুনিয়াতেই পরকালের বাসস্থান নির্ধারণ করা উচিত।

হযরত খাজা ইবরাহীম বিন আদহাম (রহ.) যে দিন বাদশাহী ছেড়ে নিঃস্ব জীবন ইখতিয়ার করলেন সে দিন তাঁর একটি ছেলে জন্ম হয়েছিলো। ছেলেটি যুবক হওয়ার পর হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে হেরেম শরীফে গেলেন, খাজা ইবরাহীম বিন আদহাম তাঁকে দেখামাত্রই জড়িয়ে ধরে আবেগাপ্লুত অবস্থায় বললেন, বৎস! তোমার মাকে সালাম বলবে। ছেলে বললো বাবা!যখন থেকে আমার বুদ্ধি-জ্ঞান হয়েছে আমি আপনার খোঁজে নিমগ্ন, যেন আপনার খেদমত করতে পারি। আজ পেয়েছি, কি করে ছেড়ে যাই? তিনি বললেন, ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। অতএব আমার সংস্পর্শে না থেকে তোমার মায়ের কাছে চলে যাও। আল্লাহ চাইলে কিয়ামত দিবসে সাক্ষাৎ হবে।

ছেলে বললো, বাবা! কিয়ামত দিবসে অনেক ভীড় হবে, আমি আপনাকে কোথায় খোঁজ করব?

বললেন ঃ পুলছিরাতের নিকট।

বললো ঃ সেখানে না পেলে?

বললেন ঃ মিজানের নিকট।

www.pathagar.com

বললো ঃ মিজানের উভয় পাল্লার মধ্যেকার দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তার অনুরূপ; কোন পাল্লার নিকট খোঁজ করব?

বললেন ঃ পাপাচারের পাল্লার নিকট।

বললো ঃ সেখানেও যদি না পাই?

বললেন ঃ বিচার কার্যাদির কুর্সির নিকট।

বললো ঃ বাবা! সেখানে দুটি কাতার থাকবে একটি নেক্কার লোকদের অপরটি পাপাচারীদের, আপনাকে কোন কাতারে খোঁজ করব?

বললেন ঃ পাপাচারীদের কাতারে।

বললো ঃ বাবা সেখানেও না পেলে?

বললেন ঃ দোযখের দরজার কাছে।

বললো ঃ সেখানে না পাওয়া গেলে?

বললেন ঃ দোযখের দারোগার নিকট জিজ্ঞেস করবে, ইবরাহীম পাপাচারীকে কোন্ দোযখে নিক্ষেপ করেছেন?

বললো ঃ সেখানেও যদি পাওয়া না যায় তাহলে কোথায়?

বললেন ঃ বেহেশতে, কেননা রাস্তা কেবল দু'টি একটি বেহেশতের অপরটি দোযখের। দোযখে পাওয়া না গেলে বেহেশতে অবশ্যই পাবে।

জনৈক খোদাভীরু তাঁর লিখিত এক পত্রে বন্ধুকে সম্বোধন করে লিখেছিলেন, ভাই! কাজ খুবই প্রকট থেকে প্রকটতর এবং দীর্ঘ রাস্তা সামনে, গাফেল হয়ো না। তোমার জানা নেই দুনিয়া থেকে যাবার কালে মুমিন হিসেবে যাবে না কি কাফির, মুখলিছ অবস্থায় যাবে না কি মুনাফিকির সাথে, সুন্নতসহ যাবে না বেদাতসহ। আনুগত্যের সাথে যাবে না পাপাচারের সাথে। খাতেমা নেক্কার মোত্তাকিনদের ধর্মের উপর হবে না কি ফাসেক পাপাচারী লোকদের ধর্মের উপর হবে।

বস্তুত তোমার জানা নেই, তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালক সন্তুষ্ট আছেন না কি অসন্তুষ্ট।

মুনকির-নকিরের সামনে কবরে তোমার অবস্থা কিরূপ হবে। তাদের প্রশ্নের জবাব কিভাবে দিবে এবং আমাদেরকে বেহেশতে নবী-সিদ্দিক ও

www.pathagar.com

নেক্‌কারদের সাথে রাখা হবে না কিং দোযখে কাফির-মুনাফিক ও শয়তানের সাথে নিক্ষেপ করা হবে। জনৈক খোদাভীরু রাতদিন সব সময়ে কান্নাকাটি করতেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, অমন করে কান্নকাটি করছেন কেন?

বললেন ঃ কা'য়াব আহবারের বর্ণনায় শুনেছি, প্রত্যহ পাঁচবার কবর মানুষকে আহ্বান করে, হে আদম সন্তান! তোমরা আমার উপর গুনাহ্ করো, আমার অভ্যন্তরে শাস্তি ভোগ করবে। আদম সন্তানগণ আমার উপর স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে জীবন-যাপন করছে, অথচ আমার উপর বসে আল্লাহ্‌র নেয়ামত ভক্ষণ করছে! সুতরাং আমার অভ্যন্তরে তোমাদেরকে পোকা-মাকড় দংশন করবে।

কিয়ামতের পর্যালোচনা ও তার কঠোরতা

কিয়ামত ঃ বিচার দিবসকে বলে, যে দিন পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেয়া হবে। হাদীসে আছে, বেহেশত তার পূর্ণ সাজসজ্জাসহ নেক্‌কারদের জন্য সদা প্রস্তুত এবং পাপাচারীদের জন্যে দোযখের শাস্তি ও মুছিবত। সে দিনের ভীতিতে শক্তিশালী পর্বতমালাও বালুকণার মত উড়তে থাকবে। অন্য আর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, নবীগণ সে দিনের ভয়ে ভীত কম্পিত হবেন, এবং ইয়া নাফছি বলবেন। কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)-ই কেবল ইয়া উম্মতী, ইয়া উম্মতী বলবেন।

বর্ণিত আছে, কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতায় শিশু-কিশোর ও তরুণদের মাথার চুল সাদা হয়ে যাবে। শিশুরা তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রীরা তাদের স্বামী হতে পলায়ন করবে। আসমান ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হবে। কথিত আছে, সে দিনের ভয়াবহতা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও মহানবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পিতা-মাতা হতে দূরে থাকবেন। লূত (আ.) তাঁর স্ত্রীর সংস্পর্শ ত্যাগ করবেন। এবং আর সব নবী তাঁদের পুত্রদের মায়া ও সংস্পর্শ ছেড়ে দিবেন। তাবৎ নক্ষত্রই সাগর মহাসাগরে নিপতিত হবে। সমুদ্রের পানি অগ্নি সাদৃশ উত্তপ্ত হয়ে যাবে। সৃষ্টিকুল পান করার মত কোনো পানি পাবে না। হযরত ইসরাফিলের প্রথম ফুৎকারে তাবৎ মাখলুকই মৃত্যুবরণ করবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ফুৎকারে সবাই জীবিত হবে। ফুৎকার দেওয়ার যন্ত্রটি শিংয়ের সদৃশ তার অগ্রভাগের সীমানা আসমান যমীনের দূরত্ব অনুরূপ।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, লোকেরা কবর থেকে তিন হাজার বছরের ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত হয়ে উঠবে। কারোর ঠোঁট ওষ্ঠদ্বয় পর্যন্ত সঞ্চালন করার তাকত থাকবে না। উম্মত-জননী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে দিন নারীদের অবস্থা কেমন হবে?

বললেন ঃ আয়েশা! কিয়ামতের ভয়াবহতা এমন কঠোর হবে যে, কারোর কোনো দিশা থাকবে না– বস্ত্র পরিহিত না কি বস্ত্রহীন, কে পুরুষ আর কে নারী।

উল্লেখ আছে, সপ্ত যমিন ও আসমানের সৃষ্টিকুল খালি পা, ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত অবস্থায় হাসরের ময়দানে উপস্থিত হবে। হাসরের ময়দানে কোনো ধরনের লুকোচুরি করার সুযোগ থাকবে না। পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হবে। এক নেযাহ পরিমাণ মাথার উপর থাকবে। সেখানে কোনো ধরনের ছায়া থাকবে না। অবশ্য নেক্‌কারদের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালার আরশ ছায়া হিসেবে কাজ করবে। সূর্যের প্রখরতা এত বেশি হবে, লোকেরা দেহ থেকে নির্গত ঘামের সাগরে ভাসতে থাকবে, কেউ তাদের উরু পর্যন্ত, কেউ কোমর পর্যন্ত, কেউ বা একেবারেই ডুবে যাবে। এরপর পুলছিরাতে যাবার নির্দেশ হবে, পুলছিরাত বিচার কার্য সম্পাদনের স্থান, সেখানে সকলের বিচার কার্য সম্পাদন করা হবে। পুলছিরাত এমন একটি সাঁকো যা দোযখের সামনে অবস্থিত তরবারীর চেয়ে ধারালো, কেশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম কেউ তা হাওয়ার মত দ্রুতগতিতে পাড়ি দিবে। কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার সদৃশ, কেউ বিজলির অনুরূপ, কেউ শিশুদের চলার মত করে পাড়ি দিবে। এবং কতেক পাড়ি দিতে না পেরে দোযখে লুটিয়ে পড়বে।

(আল্লাহ পানা দিন) কিয়ামত দিবস মানুষের পাপ পুণ্য উড়ে এসে তাদের হস্তগত হবে। প্রত্যেকেই জানতে পারবেন কে কি করেছেন। মুমিনদের আমলনামা তাদের ডান হস্তে দেয়া হবে এবং কাফিরদেরকে বাম হস্তে। এরপর স্ব স্ব আমলনামা পাঠের নির্দেশ দেয়া হবে। কোনো মুমিনকে

www.pathagar.com

তাঁর আমলনামা বাম হস্তে অথবা পিছন থেকে দেয়া হবে না। হোক সে শত পাপী ও ফাসিক। এভাবে কিয়ামত দিবসে কোনো মুমিনের মুখ-অবয়ব কালো হবে না শত পাপী ও ফাসিক হওয়া সত্ত্বেও। কাফিরদের মুখ-অবয়ব কালো হবে। তাদের আমলনামা বাম হাতে ও পশ্চাৎ থেকে দেয়া হবে। তারা দেখবে না, আমলনামা যাদেরকে ডান হস্তে দেয়া হবে তাঁরা নিঃশর্ত মুক্তিপ্রাপ্তদের সামিল আর বাম হস্তে ধারণকারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কাফির সম্প্রদায় আমলনামা নেয়ার জন্যে ডান হাত প্রসারিত করবে এবং বাম হাত পশ্চাৎমুখী করবে। তারা ভাববে এটাই বুঝি মুক্তির পথ, ফেরেশতারা তাদের ডান হাত সিনার উপর ছুঁড়ে মারবে, এরপর তারা বাম হাত পিছন থেকে প্রসারিত করবে, ফেরেশতারা তাদের ঘাড় দুমড়ে মুচড়ে মুখ অবয়বকে পশ্চাৎমুখী করে দিবে। তারপর নেক বান্দারা তাঁদের আমলনামা পঠনকালে পূর্ণ আমলনামাই ইবাদত-বন্দেগীতে ভরপুর দেখবে, খুশিতে আবেগাপ্লুত হয়ে বন্ধু-বান্ধবকে বলবে– এটা পাঠ করে আমি পূর্ণ সন্তোষ লাভ করেছি।

কাফিররা তাদের আমলনামা পাঠ করে ফরিয়াদ ও রোনাজারী করবে। দোযখের প্রধান ফটকের প্রহরী ফেরেশতাকে নির্দেশ দেয়া হবে, ওদেরকে অগ্নি-জিনজিরে আবদ্ধ করো। ফেরেশতারা তাদেরকে সত্তরটি অগ্নি-জিনজিরে বেঁধে ফেলবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জিনজির তাদের মুখ দিয়ে পুরে পিছন দিকে বের করা হবে। এরপর জিনজিরের বাহির অংশ তার গ্রীবার সাথে পেঁচিয়ে দেয়া হবে।

উল্লেখ আছে, কিয়ামতের কঠোরতা থেকে কেউই মুক্তি পাবে না, যতক্ষণ সে অপরের তছরুপকৃত হক আদায় না করবে।

কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক অত্যাচারিত লোক তাদের ওপর অনুষ্ঠিত নির্যাতনের ইনসাফ পাবে, রাজা-বাদশাহ ও বিচারকরা সেখানে অপমানিত ও লাঞ্ছিত বোধ করবে। বিধাতার সৃষ্টের পদতলে পিঁপড়া অনুরূপ পদদলিত হবে।

www.pathagar.com

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত; কিয়ামত দিবসে প্রত্যেককে মিজানের নিকট তথা উভয় পাল্লার মধ্যখানে দণ্ডায়মান করা হবে এবং ফেরেশতাগণ তাদের গতি নিয়ন্ত্রণ করবে। মিজানে ইবাদত-বন্দেগীর পাল্লা যদি ভারী হয় তাহলে তাঁরা সজোরে চিৎকার করে বলবে অমুকের ছেলে অমুক সৌভাগ্যবান। ইবাদত-বন্দেগীর পাল্লা যদি হালকা ও বদির পাল্লা ভারী হয় তাহলে তাঁরা বলবেন, অমুকের ছেলে অমুক দুর্ভাগা তার থেকে এমন গর্হিত কাজের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অসম্ভব। কিয়ামতের প্রতিটি দিনই পঞ্চাশ হাজার বছরের অনুরূপ হবে।

সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিবস যদি এত কঠোর হয় তাহলে মানুষের অবস্থা কেমন হবে?

বললেন, আল্লাহর কসম মুমিনদের অবস্থা এমন হবে যেমন তোমাদের কাছে নামাজের ওয়াক্ত।

আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদিগকে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

জাহান্নাম ও তার শাস্তি

দোযখকে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত করে বলা হবে, আপন প্রতিপালকের আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ করো। সে সত্তর হাজার শক্তিশালী জিনজিরে বাঁধা অবস্থাসহ উপস্থিত হবে তার সর্বনিম্ন কয়লাটির সীমারেখা দু'শত বছরের রাস্তা অনুরূপ, সকল নবী তখন তাঁদের আসন ছেড়ে অবতরণ করবেন, সকল মাখলুক দ্বি-জানু হয়ে তাদের কাছে আরজ করবে, আমার খবর নিন আমার খবর নিন। কাফিরদেরকে তাদের কপালের চুল পদদলিত অবস্থায় উপস্থিত করা হবে এবং দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। হাজার বছরের ক্ষুধার তাড়নায় ফরিয়াদ ও রোনাজারী করবে। ক্ষুধা নিবারণের জন্য তাদের সামনে 'যাক্কুম' ও 'যোহর বৃক্ষ' পেশ করা হবে, 'যোহর বৃক্ষ' আগুনের তৈরী, দোযখের পাদদেশ থেকে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি দরজায় তার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত থাকবে। দোযখের এমন কোনো স্থান বাকী থাকবে না যেখানে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত না থাকবে।

www.pathagar.com

বিশ্বাস করুন, সে বৃক্ষের ফল দেও সাদৃশ্য অদ্ভুত এবং স্বাদে যহর-বিষে পূর্ণ: ফলগুলো মটকার সমান বিষে ভরা। কাফির তার দ্বারাই পেট ভরাবে, এরপর পিপাসায় কাতর হয়ে হাজার বছর পর্যন্ত ফরিয়াদ করবে। পিপাসা নিবারণের জন্য তাকে 'হামীমা' দেয়া হবে, তারা তা পণ করবে কিন্তু তৃপ্ত হবে না।

উল্লেখ আছে, দোযখের অগ্নি হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বল করে লাল বানানো হয়েছে, এরপর হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বল করে কালো, এখন তার রং কালো।

বর্ণিত আছে, দুনিয়ার আগুনকে রহমতের বারিধারায় সত্তর বার ধৌত করা হয়েছে, এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ তার নিকটে যেতে সক্ষম হয় না, অথচ দোযখের অগ্নি এত অসহনীয় তারপরও মানুষ তার মধ্যেই অবস্থান করতে বাধ্য হবে।

হাদীসে আছে, দোযখ তার প্রতিপালককে বলবে, হে প্রতিপালক! আমার কতেক অংশ অপর কতেককে খেয়ে ফেলবার উপক্রম হয়েছে। ইরশাদ হলো, শ্বাস গ্রহণ করো একটি গরমকালে অপরটি শীতকালে। বস্তুত শীত ও গরম দোযখের সে শ্বাসের কিঞ্চিত প্রতিক্রিয়া।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, দোযখের সর্বনিম্ন আযাব, আগুনের দু'টি জুতা পরিধান করানো হবে যার প্রখরতায় মাথার মগজ টগবগ করবে, বিশ্বাস করুন। দোযখ প্রজ্জ্বলের বস্তু দু'টি। এক. মানুষ, দুই. গন্ধকপূর্ণ পাথর। যার বিশেষ পাঁচটি স্বভাব অন্য আর কোনো পাথরে নেই।

এ পাথর আগুনে তার চামড়া প্রজ্জ্বলন করে অতঃপর আগুন নিভে গেলে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়, অসহনীয় গন্ধ ছড়ায়, প্রকট থেকে প্রকটতম গরম হয়।

কাফিরদেরকে সে পাথর দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে, দোযখের আগুন সম্পর্কে মোটামুটি সকলেই অবগত। অথচ সে সম্পর্কে মানুষেরা কোনো চিন্তা করে বলে মনেই হয় না।

বর্ণিত আছে, দোযখ প্রত্যহ আল্লাহ তা'য়ালাকে বলে, হে প্রতিপালক! আমার প্রখরতা কঠোরতর রূপ ধারণ করেছে, আমার ক্রোধ-সীমাহীন

www.pathagar.com

গভীরে পৌঁছেছে, আমার বেড়ি আমাকেই আবদ্ধ করে চলছে, হুকুম দিন পাপাচারীদের কঠোরভাবে পাকড়াও করে যথা উচিৎ শাস্তি প্রদান করি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, 'অয়েল' দোযখের একটি উপত্যকার নাম, দুনিয়ার তাবৎ পাহাড় পর্বত ও উপত্যকাকে যদি তাতে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে সবই গলে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা পানাহ্ দিন।

কিয়ামত দিবসে নির্দেশ হবে কাফিরদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করো, তখন তারা পরস্পর কথোপকথন করে শপথ করে বলবে– আমরা দুনিয়ায় কাফির ছিলাম না। আল্লাহ তা'য়ালা প্রমাণ স্বরূপ তাদের মুখের উপর মোহর এটে দিবেন। তাদের হাত-পা তাদের কুফরী সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে, এরপর তাদের মুখ খুলে দেয়া হবে, তারা নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জিজ্ঞেস করবে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন?

তারা জবাব দিবে, আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে বলবার নির্দেশ করেছেন, তারপর তারা (কাফিররা) নিজেরাই আপন কৃতকর্মের কথা স্বীকার করবে।

দোযখ কাফিরদের জন্যে বানানো হয়েছে। বেহেশত যেমন মুমিনদের জন্যে। মুমিন যদি লাখো পাপাচারে লিপ্ত হয় তাহলে সেও তার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করে ঈমানের বদৌলতে দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করবে। মুমিনের শাস্তি লাঞ্ছনার উদ্দেশ্যে নয়, পাক পরিষ্কারের জন্যে। কিন্তু কাফিরদের শাস্তি অপমান ও লাঞ্ছনার উদ্দেশ্যে, তারা সেখানে সর্বদা অবস্থান করবে, মুক্তির কোনো সুযোগ থাকবে না।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, দোযখের সৃষ্টি অনন্তকালের জন্য, ফানা হবার নয়। সে চিরস্থায়ী।

দোযখের বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছু, আযাব-শাস্তি, পুলসিরাতের পাড়ি ও কিয়ামতের কঠোরতার সম্পর্কে অঙ্গীকার রয়েছে, যদি কেউ গোলাম আযাদ করেন তাহলে সে নিঃশর্ত পুলসিরাত পাড়ি দিতে পারবে। আল্লাহর কালামের মধ্যে গোলাম আযাদ এর প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এই বাণী শোনার পর সাহাবীরা আরজ করলেন, গোলাম আযাদের সাধ্য না থাকলে?

www.pathagar.com

ইরশাদ হলো, ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াবে। তা না হলে দুর্ভিক্ষেরকালে যখন খাবারের খুবই অভাব তখন কোনো ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াবে। তাহলে পুলসিরাতের ভয়াবহ পথ নিঃশর্ত চিত্তে পাড়ি দিতে পারবে।

গীবত

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, গীবত দ্বারা রোজা ভেঙ্গে যায়। এর অর্থ হচ্ছে, রোজা অবস্থায়ও যদি কেউ গীবত থেকে বিরত না হয় তবে তার সেই রোজা অর্থহীন হয়ে যায়। এর দ্বারা কোনো ছওয়াব আশা করা যায় না।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, যে মুসলমান ব্যক্তি রোজাদার অবস্থায়ও গীবত করে তার রোজা বাতিল হয়ে যায়। অনুরূপ তার অযুও ভেঙ্গে যায়।

গীবত বলা হয় কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কিছু বলাকে যা সে ব্যক্তি শুনতে পেলে অসন্তুষ্ট হবে।

হাদীস শরীফে রয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– গীবত যেনা বা ব্যভিচারের চাইতেও জঘন্য অপরাধ।

যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের গীবত করে সে যেন সে ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার শরীরের হাড়-মাংস চিবিয়ে খেলো।

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে-কেরামকে নিয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ করেই মৃত পঁচা লাশের দুর্গন্ধ আসতে লাগলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি বুঝতে পারছো এই দুর্গন্ধ কিসের?

সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দুর্গন্ধ কোথা থেকে আসছে, তা আমরা বুঝতে পারছি না। তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এই দুর্গন্ধ ঐসব লোকের মুখ থেকে বের হচ্ছে, যারা লোকের গীবত করেছে।

www.pathagar.com

হাদীস শরীফে রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের গীবত করেছে, হাশরের ময়দানে সে ব্যক্তির মরা-পচা গোশত তার সামনে রেখে তাকে সেই পচা মাংস গলাধঃকরণ করতে বাধ্য করা হবে। গীবতকারী তখন নিরুপায় হয়ে সেই পঁচা গোশত খেতে থাকবে এবং চিৎকার করতে থাকবে।

হাদীস শরীফে এরূপ বর্ণনাও রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের আড়ালে তাঁর গীবত করবে, হাশরের ময়দানে সেই গীবতকারীর মুখ পিছন দিকে করে দেওয়া হবে।

প্রত্যেক মুসলমানেরই সতর্কতার সাথে গীবত থেকে দূরে থাকা উচিত। কেননা, বদভ্যাসটির দ্বারা তিন প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

যেমন–

(১) গীবতকারী ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় না।

(২) এরূপ লোকের নেক কাজ ও লিখা গ্রহণযোগ্য হয় না।

(৩) সে ব্যক্তির পাপের পাল্লা অনেক ভারী করে দেওয়া হয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, গীবত করাটা মুখরোচক হলেও আখেরাতে গীবতকারীকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

বর্ণিত আছে যে, একদিন একজন বেঁটে স্ত্রীলোক হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে কিছু বাক্যালাপ করে চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রা.) মন্তব্য করলেন, মেয়ে লোকটা কথা-বার্তায় এবং ভাষা প্রয়োগে চমৎকার! আহ্! যদি সে এমন বেঁটে না হতো।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আয়েশা! তুমি কিন্তু স্ত্রী লোকটির গীবত করে ফেললে। আয়েশা (রা.) বললেন, যে ত্রুটিটুকু তার মধ্যে রয়েছে, আমি তো শুধু তাই উল্লেখ করলাম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি এই ত্রুটি তার মধ্যে না থাকতো এবং তারপরও তুমি তা আরোপ করতে তবে তো সেটা অপবাদে পরিণত হতো।

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, গীবতকারী ব্যক্তিকে আল্লাহপাক দশ ধরনের আযাবে পতিত করে লাঞ্ছিত করবেন।

যেমন–

(১) সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

(২) সমস্ত ফেরেশতাকুল গীবতকারী ব্যক্তির প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকবে।

(৩) তার মৃত্যু হবে কঠিন অবস্থার মধ্যে।

(৪) দোজখের আগুন তার নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

(৫) সে ব্যক্তি বেহেশতের হকদার হবে না।

(৬) তার উপর কবরে কঠিন আযাব হবে।

(৭) তার এবাদত-বন্দেগীর ছওয়াব আশঙ্কাজনক ভাবে কমে যাবে।

(৮) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মোবারক এ ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট থাকবেন।

(৯) সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার ক্রোধের ভাগী হবে।

(১০) হাশরের ময়দানে মীজানের সামনে কঠিন সমস্যা দেখা দিবে।

কোন এক বুযুর্গকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে গীবতকারীর মুখের দুর্গন্ধ অনুভূত হতো, বর্তমানে তা আমরা অনুভব করতে পারি না এর কারণ কি? জবাবে বুযুর্গ বলেছিলেন, প্রথমত: সে যুগের তুলনায় এ যুগের মানুষের অনুভূতি অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। সেই সূক্ষ্ম অনুভূতি আর এখন অবশিষ্ট নাই।

দ্বিতীয়ত: যেসব লোক তীব্র দুর্গন্ধের মধ্যে কাজ-কর্ম বা গোদামে বসবাস করে তাদের নাকে দুর্গন্ধের অনুভূতি থাকে না। হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ সেখানে আসলে তার নাকে যেরূপ দুর্গন্ধ অনুভূত হয়, চামড়ার দোকানে কর্মরত মানুষদের মধ্যে তেমনটা মোটেও অনুভূত হয় না। আমাদের এই যুগে গীবতের পরিবেশমুক্ত সমাজ খুঁজে পাওয়া কঠিন বিধায়ই এর প্রতিক্রিয়াটা সকলের নিকট সহনীয় হয়ে গিয়েছে।

www.pathagar.com

অন্য এক বুযুর্গের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, গীবতকারী ব্যক্তি যদি তার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে তবে তার সেই তওবা কি কবুল হবে।

বললেন, কবুল হবে আর এই তওবার দ্বারা যে ব্যক্তির গীবত করা হয়েছে তাকেও আল্লাহপাক ক্ষমা করবেন। গীবতের কথা শুনে সে ব্যক্তি মনে যে কষ্ট পেয়েছিল গীবতকারীর তওবা করার ফলে আল্লাহ্ পাক তার ক্ষতিপূরণ করে দিবেন আর যদি তওবা না করে তাহলে হাশরের বিচার দিনে গীবতকারীর নেক আমল থেকে যার গীবত করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করা হবে।

মাতা-পিতার হক

মায়ের হক পিতার তুলনায় অগ্রগণ্য।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– "বেহেশত মায়ের পায়ের নীচে।"

অর্থাৎ, সন্তানের বেহেশত প্রাপ্তি মায়ের প্রতি অনুগত থাকা তাঁদের খেদমত করা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকা দ্বারাই সম্ভব হবে।

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মর্যাদা দান এবং সেবাযত্ন করার ক্ষেত্রে কার দাবী অগ্রগণ্য?

বলেছিলেন, মায়ের দাবী।

এভাবে তিনবার জিজ্ঞাসার জবাবেই বলেছিলেন, মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার অগ্রাধিকার রাখে। চতুর্থ বারের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, অতঃপর পিতার অধিকার এবং পিতার নিকটবর্তীজনদের।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন, মাতা-পিতার সন্তুষ্টির দ্বারাই আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুমিন ব্যক্তির মাতা-পিতা তার প্রতি তুষ্ট তাদের বলে দাও, তোমরা

www.pathagar.com

বেহেশতবাসী হবে। তোমাদের দ্বারা কোনো গোনাহ্-খাতা হয়ে গেলেও আল্লাহ্ পাক তা ক্ষমা করে দিবেন। অপর দিকে যদি মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট করতে না পারো তাহলে হাজার এবাদত-বন্দেগী করার পরও দোযখ হবে তোমাদের ভাগ্যলিপি।

এরূপ বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেউ যদি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আবেগ নিয়ে মাতা-পিতার চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করে তাহলে আল্লাহ্ পাক সে ব্যক্তিকে একটি নফল হজ্বের সমান নেকি দান করবেন। প্রশ্ন করা হলো, যদি কেউ একশত বার এরূপ দৃষ্টিপাত করে? বললেন, একশত বারই সে অনুরূপ নেকি লাভ করবে।

বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, খুব বড় ধরনের গোনাহ্ হচ্ছে মাতা-পিতাকে গালি শোনানো।

বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেউ কি নিজের মাতা-পিতাকে গালি দেয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, মনে করো তুমি কারো মাতা-পিতাকে গালি দিলে আর সে ব্যক্তি জবাবে তোমার মাতা-পিতাকে গালি দিল; এর দ্বারাই কি নিজের মাতা-পিতাকে গালি শোনানো হলো না?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ভোরে শয্যাত্যাগ করে প্রথমেই মাতা-পিতার নিকট হাজির হয় তাঁদের সেবা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক তার জন্য বেহেশতের দু'টি দরজা খুলে দেন। অনুরূপ যে ব্যক্তি ভোরে শয্যাত্যাগ করে মাতা-পিতার নিকট হাজির হয়ে তাঁদের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা, জিজ্ঞেস করে তা পূরণ করার চেষ্টা করে সে ব্যক্তি সমগ্র দিন আল্লাহ্ তা'য়ালার বিশেষ রহমতের ছায়ায় অবস্থান করে।

সন্তানদের বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে মাতা-পিতা কাফের হলেও তাদের সেবাযত্নে নিয়োজিত থাকা, কোনো অবস্থাতেই বিরক্ত না হওয়া। কাফের মাতা-পিতার জন্য সন্তানের উচিত দোয়া করতে থাকা যেন তাঁদের ঈমানের দৌলত নছিব হয় ও আখেরাতের জীবন নিরাপদ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

হাদীস শরীফে এরূপ বর্ণনাও রয়েছে যে, কোনো সন্তান যদি মাতা বা পিতাকে সালাম দেয়, তাহলে সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ পাক হাজার বার রহমত প্রেরণ করেন।

মাতা-পিতার বিশেষ একটি হক হচ্ছে, যদি তাঁরা মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তবে সন্তানরা নিজ দায়িত্বে তাঁদের জানাযা আদায় করবে ও কাফন-দাফন সম্পন্ন করবে। তাঁদের কোনো অঙ্গীকার বা ওসিয়ত থাকলে তা পূরণ করবে। তাঁদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করবে এবং তাঁর পোষ্য-পরিজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন কেউ যদি তার পরলোকগত মাতা-পিতার সাথে সাক্ষাত করতে চায় তবে তার কর্তব্য হচ্ছে, মাতা-পিতার বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাত করা।

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের জন্য সাধ্যমত সদকা দান করা উচিত। এর দ্বারা তাঁদের সর্বোত্তম সেবা হয়ে থাকে।

বর্ণিত আছে যে, এক বুযুর্গ ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি পাথর পড়ে থাকতে দেখলেন। পাথরটা তিনি ডান দিকে ফেলে দিয়ে বললেন, এই সৎকর্মটুকু আমার পরলোকগত মায়ের জন্য করলাম। অনুরূপ আর একটি পাথর পড়ে থাকতে দেখে উঠিয়ে পয়ের বাম দিকে ফেলে দিয়ে বললেন, এই কাজটি আমার পরলোকগত পিতার জন্য করলাম। অর্থাৎ, আর্থিক সামর্থ না থাকলেও কায়িক শ্রমের মাধ্যমে ছোটখাটো সৎকাজ করে ওর ছওয়াব পরলোকগত মাতা-পিতার জন্য প্রেরণ করা যায়।

তাবেয়ীগণের মধ্যে থেকে কোনো এক বুযুর্গ বলেছেন, সন্তান যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর মাতা-পিতার জন্য দোয়া করে তবুও সে আংশিক ভাবে হলেও মাতা-পিতার হক আদায় করলো।

হযরত খাজা আবুল লাইস (রহ.)-এর নিকট লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল যে, কারো মাতা-পিতা যদি অসন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া থেকে চলে গিয়ে থাকেন, তবে তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জন করার কোনো পন্থা আছে কি?

www.pathagar.com

জবাব দিয়েছিলেন, হ্যাঁ আছে। প্রথমত: সব ধরনের পাপকর্ম থেকে তওবা করে পূর্ণ পরহেজগারি অবলম্বন করা। মনে রেখো, মাতা-পিতার দৃষ্টিতে সন্তানের চাইতে প্রিয় আর কিছুই নাই। পরলোকগত মাতা-পিতার আত্মা যখন লক্ষ্য করবে যে, তাদের সন্তান আল্লাহ্ তা'য়ালা সন্তুষ্টি অর্জনের পথে নিয়োজিত হয়েছে। তখন তাঁদের আর আনন্দের সীমা থাকে না। তাঁরা সে সন্তানের প্রতি তুষ্ট হয়ে যান।

দ্বিতীয় : মাতা-পিতার আত্মীয়-এগানা ও প্রিয়জনদের সাথে সম্পর্ক গভীর করা।

তৃতীয় : সব সময় মাতা-পিতার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকা ও সদকা-খয়রাত করা। এসব আমলের দ্বারা পরলোকগত মাতা-পিতার আত্মাকে সন্তুষ্ট করা যায়।

প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি যেরূপ স্নেহপরায়ণ হয় সন্তানের মনে মাতা-পিতার প্রতি সেরূপ স্নেহমমতা সৃষ্টি হতে দেখা যায় না, এর কারণ কি?

জবাবে বলা হয়েছিল, প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়ার মাতা-পিতা ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা সন্তানের মাতা-পিতা হয়েছিলেন। মাতা-পিতার প্রতি মমতার কোনো উত্তরাধিকার মানব জাতির আদি মাতা-পিতা রেখে যাননি। কিন্তু সন্তানের জন্য আপত্য স্নেহের পূর্ণ উত্তরাধিকার তাঁরা রেখে গেছেন বিধায় মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের মায়া-মমতা স্বীয় সন্তানদের প্রতি স্নেহ-মমতার তুলনায় কম হয়ে থাকে।

মসিবত ও তাতে ধৈর্য ধারণ

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, ঈমানের দু'টি অংশ, একটি 'সবর' বা ধৈর্য ধারণ, অপরটি 'শুকর' বা কৃতজ্ঞতা। যে মসিবত ও অভাবের সময় ধৈর্য ধারণ করতে জানে না এবং সুস্থ-সবল ও নেয়ামত ভোগ করার কালে শুকর করতে জানে না তার মধ্যে ঈমানের সিফাত নেই। একটি হাদীসে আছে, ঈমানের মধ্যে 'সবর' এর গুরুত্ব শরীরের মধ্যে মাথার গুরুত্বের মত। সবর ব্যতীত ঈমান অসম্পূর্ণ।

www.pathagar.com

হযরত মূসা (আ.) যে দিন 'তূর' পাহাড়ে গিয়েছিলেন আরজ করলেন, হে আল্লাহ! জান্নাতে সবার চেয়ে নিকটতম মঞ্জিল আপনার কাছে কোন্‌টি। ইরশাদ হলো, 'খাতিরাতুল কুদস'। মূসা (আ.) বললেন, সেখানে কাদের বসবাস হবে?

বললেন ঃ মসিবতকালে ধৈর্য ধারণকারী এবং নেয়ামতের সময়ে শুকর গুজারকারী। মসিবত এলে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠকারীরাই কেবল 'খাতিরাতুল কুদুস'-এর অধিবাসী হবেন।

১. অসহায়ত্ব প্রকাশ না করা, ২. দান-খয়রাত প্রকাশ না করা, ৩. শত কষ্ট ও অসুস্থতায় ও হাহুতাশ না করা এবং ৪. সকল প্রকার মসিবত ও কষ্ট -ক্লেশের প্রভাব নিদর্শন প্রকাশ না করা।

একটি হাদীসে আছে, সবরের শুরু মসিবতের প্রাথমিক কাল। মসিবতের প্রাথমিক সময়ে যদি কেউ ধৈর্যধারণ না করে ধৈর্যহারা হয়ে রোনাজারী করে, তারপর 'সবর' ইখতিয়ার করে তাহলে সে 'সবরের' পূর্ণ হক আদায়কারী হিসেবে বিবেচিত হবে না। মসিবত যেমনই হোক, ধৈর্যধারণ করবে এবং বলবে–

ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। উলায়িকা আলাইহিম সালাওয়াতুমমির রাব্বিহি ওয়া রাহমা ওয়া উলায়িকা হুমুল মুফলিহুন।

এমন ব্যক্তির জন্যে বর্ণিত, দোয়াটিতে তিনটি বস্তুর আলোচনা করা হয়েছে। এক. সালাত, দুই. রহমত, তিন. হিদায়েত এবং সে সঠিক পথের পথিক, আল্লাহর দিকে 'সালাতের' নিছবত করলে তার অর্থ হয় দয়া, করুণা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাতের ঘোষণা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর উম্মত ব্যতীত আর কোন নবী ও উম্মতের উদ্দেশ্যে হয়নি। এরপর প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ্য আয়াত-দোয়াটি পাঠ করেন, সেখানে বিপদ ও মসিবতের কালে ধৈর্যধারণকারীদের জন্যে তারিফ করা হয়েছে।

কথিত আছে, আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার সবই যদি একজনকে দেয়া হয় এবং সেসব, জান্নাতের একচুমুক শরবতের

www.pathagar.com

সুসংবাদের বিনিময়ে নিয়ে নেন, এমনকি জুতার ফিতাও যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে 'সবর' করে এবং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে তাহলে তাঁর জন্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা এ তিনটি নেয়ামতের অঙ্গীকার করেছেন।

এক. সালাত, দুই. রহমত এবং তিন. হেদায়েত।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীর (রা.) একবার চেরাগ নিভে গিয়েছিলো, নিভে যাওয়ার পর তিনি বললেন, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। লোকেরা আরজ করলেন, এটাও কি মসিবত?

বললেন, হ্যাঁ, এরপর তিনি বলেন, প্রত্যেক সে বস্তু যার দরুন মুমিনের অন্তর না-খোশ হয় সেটাই মসিবত।

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বিলাপ করা

বর্ণিত আছে– প্রথম আসমানে একলাখ ফেরেশতা রয়েছে, তাঁরা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে কান্নাকাটিকারী ও শ্রবণকারীদের প্রতি অভিশাপ করেন। দ্বিতীয় আসমানে দু'লাখ, তৃতীয় আসমানে তিন লাখ, চতুর্থ আসমানে চার লাখ, পঞ্চম আসমানে পাঁচ লাখ, ষষ্ঠ আসমানে ছয় লাখ এবং সপ্তম আসমানে সাত লাখ ফেরেশতা রয়েছেন। তাঁরাও সকলেই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বিলাপকারী ও তা শ্রবণকারীদের প্রতি অভিশাপ করেন।

হযরত ওয়াহ্হাব বর্ণনা করেন, 'কোহে কাফে' সত্তর হাজার ফেরেশতা রয়েছেন, তাঁরা সকলেই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বিলাপকারী ও তা শ্রবণকারী এবং সমর্থনকারীদের প্রতি অভিশাপ করেন।

উল্লেখ আছে, কিয়ামত দিবসে যখন মৃত লোকদের জন্যে ক্রন্দনকারীকে উঠানো হবে তখন তাদের মাথা পায়ের নিচে রাখা হবে এবং সে অন্ধ হবে। তাকে বলা হবে– এখন নিজের জন্যে ক্রন্দন করো, অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং শ্রবণকারীদের ক্ষেত্রেও এ অবস্থা প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

হযরত ওয়াহ্হাব কর্তক বর্ণিত, মৃত লোকদের জন্য বিলাপকারী ও তা শ্রবণকারী উভয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে।

একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, কিয়ামত দিবসে সকল ক্রন্দনকারীকে দু'টি কাতারে সংঘবদ্ধ করা হবে। তার একটি দোযখীদের বাম দিকে অপরটি ডান দিকে ক্রন্দন করবে।

অন্য একটি হাদীসে আছে, মৃত লোকদের শোকে যারা কাপড় ছিঁড়ে চেহারার উপর আঘাত করে ক্রন্দন করে, তারা আমার তরিকার বহির্ভূত। ফাতেমা নামক জনৈক মহিলা তাঁর পিতার মৃত্যুর পর এক বছর পর্যন্ত প্রত্যহ মাগরিবের নামাজান্তে ক্রন্দন করতেন। একদা রাতে তাঁর পিতাকে স্বপ্ন যোগে দেখলেন। তাঁর পিতার শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

সে জিজ্ঞেস করলো, হে পিতা! তোমার শরীরে এগুলো কি?

বললেন, এ সবগুলোই তোমার অশ্রুবিন্দু। তুমি যা আমার প্রতি বর্ষণ করেছ।

মাতা-পিতার উপর সন্তানের হক

পিতার উপর সন্তানের হক হচ্ছে ভূমিষ্ট হওয়ার পর তার একটি অর্থবহ ভাল নাম রাখা। যখন সন্তান কিছু কিছু বুঝতে শিখে তখন থেকেই তাকে পবিত্র কুরআন এবং শরীয়তের ফরয ও সুন্নাতগুলির তালীম দেওয়া। সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়াও পিতা-মাতার দায়িত্ব। অতঃপর প্রাপ্তবয়স্ক হলে সন্তানের বিবাহশাদীর ব্যবস্থা করাও পিতার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

এক ব্যক্তি হযরত ওমর ফারুকের (রা.) খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর পুত্র সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করে বলেছিল, ছেলেটি আমার অবাধ্য হয়ে গেছে। হযরত ওমর (রা.) ছেলেটিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি মাতা-পিতার অবাধ্য হলে কেন, তুমি কি জাননা যে, এটা একটা শক্ত অপরাধ?

তখন ছেলেটি হযরত ওমরকে (রা.) লক্ষ্য করে বললো, পিতার উপর সন্তানেরও তো কিছু হক রয়েছে।

www.pathagar.com

পিতার প্রথম এবং সর্বপ্রধান কর্তব্য হচ্ছে, কোনো কমজাত কুলটা নারীর গর্ভে সন্তান জন্ম না দেওয়া। সন্তানদেরকে অকারণে মন্দ না বলা। সন্তানের একটা ভাল নাম রাখা, সন্তানকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেওয়া। ছেলেটি আরও বললো, আল্লাহর কসম, আমার গর্ভধারিণী মা বিদেশিনী। মাত্র চার দিনারে ক্রয়কৃত। জন্মের পর আমার একটা ভাল অর্থবোধক নামও রাখা হয় নাই। এমন নাম রাখা হয়েছে যার অর্থই হচ্ছে ঝগড়াটে, কু-দর্শন। সর্বোপরি আমাকে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও পড়ানো হয় নি।

একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) অভিযোগকারী পিতাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি বলছ ছেলে নাফরমান। এখন তো দেখা যাচ্ছে, এই নাফরমানির মূল উদগাতা তুমি স্বয়ং।

হযরত ছাবেত বানানী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, একদা দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি তার বৃদ্ধ পিতাকে মারপিট করছে। লোকেরা তাকে ঘিরে ধরে তিরস্কার করতে লাগলো, তুমি স্বীয় জন্মদাতা পিতার উপর হাত তুলছো? লজ্জা করে না? তখন প্রহৃত ব্যক্তি সমবেত লোকজনকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো, ভাইসব! তোমরা ওকে কিছু বলো না। এটি আমার সন্তান আমি যৌবনকালে আমার বৃদ্ধ পিতাকে মারপিট করতাম। এ হতভাগার হাতে তারই বদলা ভোগ করছি। আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার বুকেই আমার কৃতকর্মের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

এক ব্যক্তি জনৈক বুযুর্গের নিকট এই মর্মে অভিযোগ করলো যে, তার জোয়ান ছেলে তাকে মারপিট করেছে।

বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন, ওর কি কোনো শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করো নি? লোকটি জবাব দিল সেই সুযোগ সে পায় নি। ছোট সময় থেকে তাকে কৃষি কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুযুর্গ তখন বললেন, বেচারার শিক্ষা-দীক্ষা তো গরু-ছাগলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আল্লাহর শুকর আদায় করো তোমাকেও একটা গরু মনে করে সে যে তোমার মাথা ফাটিয়ে দেয় নি!

www.pathagar.com

বুযুর্গানের দ্বীনের উপদেশ হচ্ছে, সন্তান যখন কথা বলতে শিখে তখন তাকে কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" শিক্ষা দিবে। বার বার কালেমা শরীফ উচ্চারণ করিয়ে তাকে কালেমা মুখস্থ করাতে হবে।

এরপর আয়াতুল কুরসী এবং সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত মুখস্থ করাবে। যে ব্যক্তি সন্তানকে এভাবে শিক্ষা দিবে হাশরের ময়দানে সে আল্লাহ তা'য়ালার সামনে সন্তানের হক সম্পর্কিত দায় থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে।

একটু বড় হওয়ার পর শিশু যখন ডান হাত এবং বাম হাতের পার্থক্য বুঝতে পারে, তখন তাকে ডান-বামের ব্যবহার শিক্ষা দিবে। এর দ্বারা পিতা-মাতা প্রভূত পুণ্যের ভাগীদার হবে। সন্তানের বয়স যখন সাত বছর পূর্ণ হয় তখন তাকে নামাযের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকবে। দশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর নামাযের জন্য তাগিদ করবে এবং পৃথক বিছানায় শয়নের ব্যবস্থা করবে।

দেখা-শোনা এবং দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে সন্তানদের সবার প্রতি সমান ব্যবহার করবে। কোনো ফল, মিষ্টদ্রব্য বা উপহারের কিছু আনলে প্রথমে তা মেয়ে শিশুর হাতে দিবে।

সর্বোপরি সন্তানদের জন্য সর্বদা নেক দোয়া করতে থাকবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, সন্তানের জন্য পিতার দোয়া উম্মতের জন্য পয়গম্বরের দোয়ার সমতূল্য। এজন্য কোনো অবস্থাতেই সন্তানের জন্য বদ-দোয়া করবে না। তাদের অকল্যাণের কথা মনে মনেও ভাববে না। কারণ এই দোয়া বা মনের অভিব্যক্তি আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

অন্যের সন্তানের উপর বদ-দোয়া করা বা তাদের অকল্যাণ কামনা করাও ঠিক নয়। কেননা, এর প্রতিক্রিয়া নিজের সন্তানদের উপর পতিত হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে না হলেও কিছুদিন পর এরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

www.pathagar.com

বলা হয় যে, শিশু ইউসুফকে ভাইয়েরা হিংসা করে কূপে নিক্ষেপ এবং কৃতদাস রূপে বিক্রি করে দিয়েছিল যার কিছুকাল দেরীতে হলেও তাদের সন্তানেরা কারারুদ্ধ হয়েছিল।

হাদীস শরীফে রয়েছে যে, আল্লাহ পাক সেসব লোকের উপর রহমত করে থাকেন যারা সন্তানদেরকে স্নেহ-মমতার সাথে সৎকর্মে উৎসাহিত এবং অসৎ কর্মে নিষেধ করে থাকে। অন্যথায় ঐসব সন্তান গোনায় লিপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাবে পতিত হয়ে যাবে। যা পিতা-মাতার জন্য মোটেও সুখকর হবে না। জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি তাঁর সন্তানদেরকে কোনো কাজ করতে নির্দেশ দিতেন না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি সন্তানদেরকে কোনো কাজ করতে বলেন না কেন?

বললেন, আশঙ্কা হয় ওরা আমার নির্দেশের অবাধ্য না হয়ে যায়। আর এই অবাধ্যতার কারণে দোযখে যাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়। আমি আমার সন্তানদের জন্য একটা করুন পরিণতি কোনো অবস্থাতেই কামনা করতে পারি না।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

হাদীসে শরীফে উল্লেখ আছে, নিঃসন্দেহে যেসব নারী, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমযানের রোযা রাখে এবং কু-কর্ম থেকে বিরত থাকে, স্বামীর আনুগত্য করে তারা তাদের ইচ্ছা মোতাবেক যে দরজা দিয়ে মন চায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীসে আছে, যে সকল নারী সপ্তাহের সাত দিনই তাঁদের স্বামীর খেদমত করবে, তাঁরা জান্নাতের সাত দরজার যে কোনো একটি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অন্য হাদীসে আছে, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত আর কারোর জন্যে সেজদা বৈধ হলে আল্লাহ তা'য়ালা নারীদেরকে স্বামীকে সেজদা করার নির্দেশ দিতেন।

www.pathagar.com

অন্যত্র বর্ণিত আছে, জনৈকা মহিলা নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কি কর্তব্য?

বললেন, স্বামী থেকে বিরত থাকবে না, যদিও সে উটের আস্তাবলে বসবাস করে। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখবে না। হুকুম অমান্য করে রোযা রাখলে তার প্রতিদান স্বামী পাবে। অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের হবে না। অনুমতি ব্যতীত বের হলে ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্যে অভিশাপ করেন।

হযরত কাতাদার (রা.) রেওয়ায়েত, নারীদেরকে নামাজের প্রশ্ন করার পর স্বামীর হক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

কথিত আছে, নামাজান্তে নারীরা যদি তার দোয়ায় স্বামীকে শামিল না করেন তাহলে অপর নামাজের দোয়া পর্যন্ত নামাজকে তার অবস্থার উপর রক্ষিত করা হয়। নবী করীম (সা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, স্বামীর নাকের একছিদ্র দিয়ে যদি ময়লা ও অপর ছিদ্র দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয় আর একে স্ত্রী অসহনীয় বোধ করে, তাহলে সে স্বামীর হক পালনকারী হিসেবে গণ্য হবে না।

হাদীসে আছে, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, আমার কর্তব্য যেমন উম্মতের প্রতি নারীদের কর্তব্য তেমন স্বামীদের প্রতি, যারা স্বামীর হক বিনষ্ট করে তারা যেন আল্লাহ তা'য়ালার হক বিনষ্ট করলো। এরপর তিনি বলেন, নারীর সম্পদ যদি স্বামীর প্রতি ব্যয় হয় তাহলে কখনো খোটা দিবে না, স্বামীর কাছে তালাকের আবেদন করবে না। ক্ষুধার্ত, নিঃস্বতা ও দুরবস্থার কালে স্বামীর সাথে অসৎ আচরণ করবে না, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালার আযাব থেকে মুক্তি পাবে। তার সাথে নিতান্তই বিনয়ের সাথে কথা বলবে, আপন খোর-পোষের জন্যে স্বামীকে পেরেশান করবে না। স্বামীর সামনে নিজের পেরেশানী ও কষ্ট-ক্লেশের কথা বার বার আলোচনা করবে না, তার খেদমতে দুর্বলতার প্রকাশ করবে না, যতদিন পর্যন্ত সম্ভব তাকে ভালোবাসা দিবে, স্বামীর তৃপ্তির লক্ষ্যে সজ্জিত থাকবে, উঁচু কণ্ঠে

www.pathagar.com

কথা বলবে না। স্বামীর অনুমতি না নিয়ে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের মোলাকাতে যাবে না, হোক তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় নিপতিত।

অন্যত্র বর্ণিত আছে, যে নারী স্বামীর অনুমতি না নিয়ে ঘর থেকে বেরোয় চন্দ্র সূর্যসহ তাবৎ বস্তুই স্বামী সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার জন্যে অভিশাপ করে।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

স্বামীর উচিৎ নিজে যা খাবে স্ত্রীকেও তা খাওয়াবে, নিজে যা পরিধান করবে সে মানের কাপড় স্ত্রীকে পরিধান করাবে। অসৎ আচরণ ও মারপিট করবে না। আল্লাহ তা'য়ালা যখন আর্থিক স্বচ্ছলতা দিবে, তাদের খোরপোষও বৃদ্ধি করবে। সর্বদা সৎ কাজের আদেশ প্রদান করবে।

জনৈক বুযুর্গ তাঁর স্ত্রী অসৎ আচরণের প্রতি ধৈর্যধারণ করতেন। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি তা সহ্য করেন কিভাবে?

বললেন, পুরুষের উচিত নিজের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে ভাববে যদি আমি ভালো হতাম তাহলে সেও ভালো হত। শোধরানোর উদ্দেশ্যে নারীদের নেক স্বভাবকে নিজের মত মনে করবে এবং সর্বাবস্থায় তার সাথে সৎ ব্যবহার করবে।

অন্য হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) উম্মত-জননী হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) কে বললেন, এসো আমরা দু'জন একসাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করি, কে আগে যেতে পারে? প্রতিযোগিতায় উম্মত জননী সফল হলেন। নবীজি (সা.) বললেন, পুনরায়। এবার রসূলুল্লাহ (সা.) সফল হলেন। অতঃপর বললেন, আমরা উভয়ে সমান। উম্মতজননী বলেন, নবী করীম (সা.) যখন গৃহে আমাদের কাছে আসতেন, আমরা মনে করতাম যেন তিনিও আমাদেরই একজন।

স্ত্রীদের মারপিট করবে না, একান্ত প্রয়োজন হলে বিধি-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আদব শিক্ষা দেয়ার জন্যে মারবে। অবশ্য পরবর্তী সময়ে সান্ত্বনা দেয়া আবশ্যক। যেন সতর্ক ও আদব শিক্ষা দেয়ার ফায়দা বরবাদ

www.pathagar.com

হয়ে না যায়। তিনের অধিক আঘাত করবে না, বেশী মারলে পাপাচারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে, যারা স্ত্রীকে তিনের অধিক মারবে কিয়ামত দিবসে সকল মাখলুকের সামনে তাকে লাঞ্ছিত করা হবে যা পূর্বাপর সকলেই অবলোকন করবেন।

কারোর যদি নেককার বিবি থাকে এবং জীবন-যাপনে কোনো ধরনের সমস্যার সৃষ্টি না হয় তাহলে সম্পদ অর্জনের জন্যে অপর মহিলাকে বিয়ে করা সমীচীন নয়। নারীদের উচিত তাঁরা যেন স্বামীকে প্রয়োজনে অপর আরও (তিন) মহিলাকে বিয়ে করতে নিষেধ না করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা সেসকল নারীকে তার জন্যে হালাল বা বৈধ করেছেন। অবশ্য স্বামীর জন্যে তাদের খোরপোষসহ তাবৎ ক্ষেত্রে আদল ও ইনসাফ কায়েম করা আবশ্যক।

জনৈক বুযুর্গ বলেন, নারী দু'ধরনের। এক. সঠিক পথের দিশারী, দুই. সঠিক পথে বাধা সৃষ্টিকারী। এরপর তিনি বলেন, সঠিক পথের দিশারী যারা দ্বীন, ধর্ম ও নেক কাজে স্বামীর সহযোগী হন এবং বাধার সৃষ্টিকারী তারা যারা স্বামীকে ধর্মীয় কর্ম-কাণ্ডে বাধা প্রদান করেন।

হাদীসে আছে, যে নারী স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে আল্লাহর জন্যে সবর ইখতিয়ার করেন, তাঁর জন্য শহীদের মত প্রতিদান বিদ্যমান, এমন নারীকে কোনো পুরুষ যদি অনর্থক গাল-মন্দ করেন যদ্দরুন 'হদ' ওয়াজিব তাহলে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'য়ালার সম্মুখে তার প্রতি হদ জারী করা হবে।

অন্যত্র আছে, নবী করীম (সা.) বলেন, আয়েশা (রা.)! হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে নারীদের সম্পর্কে ওসিয়ত করেছেন, যদ্দরুন মনে হলো তাদেরকে তালাক দেয়া হারাম। এরপর বলেন, যে পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের হক বিনষ্ট করে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে কিয়ামত দিবসে জান্নাতের নায-নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখবেন। যে পুরুষের দু'জন স্ত্রী সে যদি তাদের খোরপোষ, বাসস্থান ও কাপড়-চোপড় ইত্যাদির ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

ইনসাফ না করে তার প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালা, ফেরেশতা ও নেককারদের অভিশাপ।

তারপর বলেন, হে আয়েশা! যে নারী তার স্বামী কর্তৃক গর্ভধারিণী সে তার গর্ভধারণ অবস্থার দিনগুলোতে সে মহিলার মত যে সর্বদা রোযা রাখে এবং রাত্রকালে জাগ্রত থেকে ইবাদত করে। প্রসব বেদনাশীল নারীর প্রতিটি মুহূর্ত একটি গোলাম আযাদ করার অনুরূপ।

দুগ্ধ পান শেষকারী নারীকে আসমান থেকে সম্বোধন করে বলা হয়, তুমি তোমার পরিশ্রমের বিনিময় পেতে থাকবে, এখন দুগ্ধ পান করানোর সময় সীমা শেষ। সামনের বাকী সব কাজের আঞ্জাম দাও।

হে আয়েশা! যে নারী তার স্বামীর প্রতি অর্পিত মোহরকে ছেড়ে দেন সে তার প্রত্যেক দেরহামের বিনিময়ে একটি কবুল হজ ও ওমরার ছওয়াব পাবে এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা তার সকল নতুন পুরাতন, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, জেনে-না জেনে যত গোনা করেছে ক্ষমা করে দিবেন। আয়েশা! যে নারী তার স্বামীর যুলুম-অত্যাচার ও কঠোরতার প্রতি ধৈর্যধারণ করবে না তার উদাহরণ সে যেন নিজেই আল্লাহর রাস্তাকে দুর্গন্ধ যুক্ত করলো।

হযরত মোয়াজ বিন জাবাল (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, যে নারী তার স্বামীর খানা পাকানোর জন্যে কষ্ট-পরিশ্রম করে তার প্রতি জাহান্নামের অগ্নি হারাম।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) নবী করীম (সা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, যে নারী দুনিয়াদারী কার্যাদিতে তার স্বামীকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে তার বিনিময়ে স্বামীর দশ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবার অনুমতি দিবেন, সে তার এ আমলের বিনিময়ে জান্নাতী পোশাক পরিধান করবে, সজ্জিত হয়ে স্বামীর কাছে যাবে তার প্রাসাদ অতিক্রম করে।

হাদীস শরীফে আছে, নেক নারী চেনার তিনটি উপায়, এক. খোদাভীতি, দুই. তাকদিরের বন্টনের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিন. মৃত্যুর জন্য তৈরী।

www.pathagar.com

জনৈক বুযুর্গ-এর বাণী, যার কাছে নিম্নের চারটি বস্তু রয়েছে সে পূর্ণ নেয়ামত হাসিলকারী হিসেবে গণ্য হবেন।

এক. সুস্থ শরীর, দুই. শুকুর-গুজার অন্তর, তিন. জিকিরকারী যবান এবং চার. নেক্‌কার স্ত্রী।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক

হাদীস শরীফে আছে যে, আত্মীয়-এগানাদের সাথে সদ্ব্যবহার মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে দেয়। মৃত্যুর পরও তার সুনাম অব্যাহত থাকে। আর সে ব্যক্তি মরেও 'মৃত' হয়ে যায় না। তার জীবনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

আত্মীয়-এগানার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজেব। আত্মীয়দের মধ্যে বিশেষ অগ্রগণ্য হচ্ছে– বোন, খালা, ফুফু, প্রভৃতি আপনজন যাদের সাথে শরীয়ত বিবাহিক সম্পর্ক অবৈধ সাব্যস্ত করেছে।

হাদীস শরীফে রয়েছে, যে ব্যক্তি রক্ত-সম্পর্ক অস্বীকার করে সে বেহেশতে যাবে না।

রক্ত-সম্পর্ক যাদের সাথে রয়েছে, তাদেরকে প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য করতে হবে। কোনো কিছু চাইলে যেন ফিরিয়ে না দেয়। কেননা, আপনজনদের প্রয়োজনে সাধ্য থাকা সত্ত্বেও সাহায্যের হাত না বাড়ানো প্রকারান্তরে তাদের সাথে সম্পর্ক অস্বীকার করারই নামান্তর।

হাদীস শরীফে রয়েছে যে, পরস্পর সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে হলেও সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করো।

আল্লামা আবুল লাইস (রহ.) তাঁর তাফসীরে লেখেছেন যে, রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া কবীরা গোনাহ। এ জন্য আল্লাহ পাক এসব লোকের প্রতি রহমত বর্ষণ বন্ধ করে দেন এমন কি এরূপ সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সাহচর্যে যারা থাকে তাদের প্রতিও আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থাকে না।

জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, আরাফার রজনীতে আমরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসাছিলাম। এ

www.pathagar.com

সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে ছিলেন, আজকের এই গোনাহ মা'ফির পবিত্র রাতেও আপনজনদের সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পর্ক ছিন্নকারীদেরকে ক্ষমা করা হবে না এবং তাদের আমলনামায় কোন পুণ্য জমা হবে না। তবে যদি কেউ গিয়ে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে নেয় তবে তাঁর মুক্তি লাভ হতে পারে। এ সময় সাহাবীগণের মধ্য হতে মাত্র একব্যক্তি উঠে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কাজ ছিল যে সাহাবীগণের জামাত থেকে উঠে গেলে। সে ব্যক্তি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একজন খালা রয়েছেন, কোনো বিষয়ে তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন আপনার পবিত্র যবান থেকে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার পরিণতি সম্পর্কে অবগত হয়ে আমি তাৎক্ষণিকভাবে খালার নিকট গিয়ে ক্ষমা চেয়েছি। তিনি তুষ্ট হয়ে আমাকে দোয়া করেছেন আমিও তার জন্য দোয়া করেছি। এরপর আমি ফিরে এসেছি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি খুব ভাল কাজ করেছ। এখন বসে পড়!

রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারি ব্যক্তি যদি কোনো জামাতের সাথেও বসবাস করে তবে আল্লাহ তা'য়ালার রহমত সেই জামাতে বর্ষিত হয় না অর্থাৎ, এই একব্যক্তির কারণে সমগ্র জামাতই আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

অপরদিকে আপনজনদের সাথে সদ্ব্যবহারে সওয়াব যত দ্রুত পাওয়া যায় অন্য নেক কাজের সওয়াব এত দ্রুত পাওয়া যায় না। অনুরূপ আপনজনদের সাথে অন্যায়ভাবে সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তির উপর যত দ্রুত আযাব নাযিল হয় অন্য কোনো বদ আমলের জন্য আযাব এত দ্রুত নাযিল হয় না।

তাফসীরবিদ ইমাম যাহ্হাক (রহ.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে লেখেছেন, কেউ যদি রক্ত সম্পর্কিতদের সাথে সদাচরণ করে তবে তার হায়াত তিন দিন অবশিষ্ট থাকলেও আল্লাহ পাক তা ত্রিশ বছর বাড়িয়ে দেন। অর্থাৎ, তার হায়াতে অস্বাভাবিক বরকত দান করেন।

www.pathagar.com

অপরদিকে রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তির বয়স ত্রিশ বছর অবশিষ্ট থাকলেও আল্লাহ পাক এই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তার আয়ু ত্রিশ বছর বাকি থাকলেও তা কমিয়ে তিন দিন করতে পারেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক নির্ধারিত তকদীর একমাত্র দোয়া ছাড়া আর কোনো কিছুতেই পরিবর্তিত হয় না। অপর দিকে আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক নির্ধারিত হায়াত বৃদ্ধি একমাত্র রক্ত সম্পর্কীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

যেসব লোক আত্মীয়-এগানাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে যায় না বা তাদের প্রয়োজনে আর্থিক সহযোগিতা করে না। তাদের রোজি থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়।

ইসলামী আদব হচ্ছে ঃ প্রতি জুমা বারে কিংবা মাসে অন্তত: একবার হলেও আপন-এগানাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা কর্তব্য। কেননা, সাধ্যমত তাদের খোঁজ-খবর নেওয়াটা একটা নৈতিক দায়িত্ব।

হযরত হাসান (রা.) বলতেন, ফরয নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে যাওয়ার সময় প্রতিটি পদক্ষেপ যেমন বরকতময় এবং পুণ্যের কাজ তেমনি দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নিতে যাওয়ার জন্য পদক্ষেপ গুলিও অনুরূপ বরকতময়।

প্রতিবেশীর হক

প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে ইসলামী শরীয়ত বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। হাদীস শরীফে এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, সন্তানের উপর স্বীয় মাতা-পিতার সেবা যত্ন করার যে দায়িত্ব প্রতিবেশীর প্রয়োজনে তাদের সেবা করার দায়িত্ব ও অনেকাংশে সে ধরনেরই।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন। প্রতিবেশী তিন শ্রেণীর হতে পারে। প্রথম শ্রেণীটি হচ্ছে, ঐসব প্রতিবেশী যারা অমুসলমান কাফের তাদেরও প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে একটি হক রয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় শ্রেণীটি হচ্ছে, মুসলিম প্রতিবেশী তাদের দু'টি হক রয়েছে। একটি হক প্রতিবেশী হিসেবে এবং অন্য আর একটি হক মুসলমান হিসেবে।

তৃতীয়টি শ্রেণীটি হচ্ছে, মুসলিম প্রতিবেশী যাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে। তাদের হক তিনটি। প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে একটি মুসলিম হওয়ার সুবাদে একটি এবং আত্মীয়তার সুবাদে আর একটি।

প্রতিবেশী রূপে আশপাশের চল্লিশটি ঘরকে ধরতে হবে। কোনো কোনো বুযুর্গ নিজের বাসস্থানের ডান-বাম এবং সম্মুখ ও পিছনের চল্লিশ ঘরকে প্রতিবেশী রূপে গণ্য করতেন এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরী জ্ঞান করতেন।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বর্ণনা করতেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রতিবেশীর হক হচ্ছে, যদি ঋণ চায় তবে সাধ্যমত তাকে ঋণ দিবে। যদি সাহায্যের জন্য আহ্বান করে তবে সাড়া দিতে হবে। অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হলে সমবেদনা জানাবে। যদি আনন্দের কিছু হয় তবে তাকে মোবারকবাদ জানাবে। যদি পড়শীর মধ্যে কারো মৃত্যু হয় তবে জানাযা ও কাফন-দাফনে শরীক হবে। যদি পড়শী বাড়ী-ঘরে না থাকে তবে তার পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা করতে হবে। নিজের খাবারের মধ্য থেকে তাদেরকে কিছু কিছু দিবে। সর্বোপরি কোনো অবস্থাতেই প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবে না। হযরত আবু যর গেফারী (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। (১) যখন উত্তম কোনো খানা পাক কর তখন অন্তত তাতে ঝোল বেশী দিও। আর তা থেকে প্রতিবেশীদের কিছু দিতে চেষ্টা করো। প্রতিবেশী যদি অভাবী হয় তবে অবশ্যই তার জন্য কিছুটা পাঠিয়ে দিও। (২) মুসলমান শাসকগণের সাধ্যমত অনুগত থাকার চেষ্টা করো। (৩) প্রতিবেশী যেরূপ চরিত্রেরই হোক সে মারা গেলে শোক প্রকাশ করো, তার জানাযায় শরীক হইও। তার যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে থাকে, তবুও তাকে ক্ষমা

www.pathagar.com

করে দিও। যদি মুসলমান হয় তবে তার জন্য দোয়া করো, যেন আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দেন।

হযরত আবু হুরায়রার (রা.) বর্ণনা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– কেউ যদি স্বীয় প্রতিবেশীকে অকারণে কষ্ট দেয় তবে তাকে আল্লাহ্ পাক জান্নাতের সুগন্ধ থেকেও বঞ্চিত করে জাহান্নামে তার স্থান নির্ধারণ করবেন।

বিশেষভাবে বুঝতে চেষ্টা করো যে, আল্লাহ্ পাক যেমন তোমাদের পরিবার-পরিজনের গোনাহ্-খাতার জন্য তোমাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন, তেমনি প্রতিবেশীদের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। প্রতিবেশী যদি ব্যবহার্য তৈষজপত্র ধার চায় তবে তাকে তা দিতে কার্পণ্য করা যাবে না। পানি চাইলে দিতে অস্বীকার করা যাবে না। থালা বর্তন দিয়েও প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করতে হবে। তাদের যে কোনো ধরনের সমস্যা সমাধান করার ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে হবে।

মোটকথা, সর্বাবস্থায় প্রতিবেশীর সাথে একাত্ম হয়ে বসবাস করতে হবে।

কর্মচারী ও খেদমতগারদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

বর্ণিত আছে, হযরত আবু যর গেফারী (রা.) তাঁর এক গোলামকে থাপ্পর মেরেছিলেন। গোলাম নবীজির (সা.) দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। নবী করীম (সা.) আবু যর গেফারীকে (রা.) তিরস্কার করে বললেন, গোলামকে আর কখনও মারধর করবে না। নিজে যা খাবে, পরিধান করবে, তাকেও তা খাওয়াবে, পরিধান করাবে। তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলে কাছে রেখো না। হযরত আবু বকর (রা.) নবী করীম (সা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, যারা আপন অধীনস্থ গোলাম-অনুচরকে কষ্ট দেয়, সৎ আচরণ করে না তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

www.pathagar.com

অন্যত্র আছে, জনৈক ব্যক্তি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপন অধীনস্থ ব্যক্তিদের সাথে যে অসৎ আচরণ করেছি তার বিনিময়ে কতবার 'তওবা' করবো?

বললেন, প্রত্যহ সত্তর বার।

বর্ণিত আছে, জনৈক সাহাবী তাঁর বন্ধুর গৃহে পানি চেয়েছিলেন, গৃহকর্ত্রী তাঁর বাঁদীকে পানি দেয়ার নির্দেশ দিলেন। বেশ খানিক বিলম্ব করায় গৃহকর্ত্রী তাকে গাল-মন্দ করলেন। শোনার পর সাহাবী বললেন, কিয়ামতের দিন যতক্ষণ তাঁর বিরুদ্ধে চারজন সাক্ষী উপস্থাপন না করবে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে কোন বাঁদীর মাধ্যমে ফরমায়েশের নির্দেশ দিবেন। এরপর সে বললেন, তুমি তার সাথে তখন যে আচরণ করেছ আল্লাহ তা'য়ালা তোমার জন্যে সে ভর্ৎসনার কাফফারা করে দিন।

এরপর তিনি তাকে নছিহত করলেন, তুমি যখন তাকে কঠোর পরিশ্রমের নির্দেশ দিবে তখন তার সাহায্য করবে। গোলাম, বাঁদিকে একত্রে দু'কাজের নির্দেশ দিবে না, রাগ করে মারপিট করবে না, অবশ্য সতর্ক ও আদব শিক্ষা দেয়ার জন্যে তিনটা পর্যন্ত বৈধ, এর অধিক মারলে কিয়ামত দিবসে তার বদলা নেয়া হবে।

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা কদাচিত তাঁদের গোলাম-বাঁদীকে কষ্ট দিলে অনুতপ্ত হতেন এবং তখনি তাকে আযাদ করে দিতেন।

বর্ণিত আছে, আমিরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা.) একদা তাঁর গোলামের কান মলেছিলেন, তারপর অনুতপ্ত হয়ে বললেন, তুমিও আমার কান মলে দাও। সে এমন ধৃষ্টতার জন্যে অপারগতা প্রকাশ করলো, কিন্তু তিনি তাকে তাঁর কান না মলা পর্যন্ত ছাড়েন নি।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, বিনা অপরাধে গোলাম-বাঁদীকে মারার কাফফারা হলো তাকে আযাদ করে দেয়া। গোলাম-বাঁদীকে দীনের আদব শিক্ষা দেয়া মালিকের প্রতি ফরয-আবশ্যক। গোলাম-বাঁদীকে মারধরকালে তারা যদি আল্লাহ তা'য়ালার নাম নেয়, তাহলে আর মারবে না, গোলাম মালিকের অবাধ্য হলে শাস্তি দেবে না, বিক্রি করে ফেলবে, গোলাম-

www.pathagar.com

বাঁদীকে প্রেমজনিত ব্যাপারে তারা যদি ভেগে যাওয়ার আশংকা হয়, তাহলে উভয়ের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দিবে।

অন্যত্র আছে, বর্তন ভেঙ্গে ফেললে গোলাম-বাঁদীকে মারবে না, কোনো গাল-মন্দ, করবে না। কেননা প্রতিটি বস্তুর একটি শেষ সীমানা রয়েছে, মানুষের মৃত্যুর সাদৃশ্য। গোলাম বহুকাল খেদমত করলে তাকে আযাদ করে দিবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে মুক্তি দিবেন। গোলামের কোনো অধিকার হরণ হলে তার দ্বারা সংশোধিত হবে।

নবী করীম (সা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি খোৎবা প্রদান কালে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করো, গোলাম মোহতাজ-এর প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তোমরা যা খাও, পরিধান করো তাদেরকেও তা খাওয়াবে, পরিধান করাবে। তাদের সাধ্যাতীত কাজের নির্দেশ দিবে না। তারাও তোমাদের মত সৃষ্ট বান্দা, মানুষ।

॥ সমাপ্ত ॥

www.pathagar.com